Approved by the Board of Secondary Education, West-Bengal, as a Bengali Rapid Reader (Prose) for Class VIII Vide Notification No. Syl. 65/55, dated 18th October 1955.

বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা

দ্বিতীয় খণ্ড

(অষ্টম শ্রেণীর দ্রুতপঠনের জন্য)

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

দেশবন্ধু বুক ডিপো
৮৪-এ, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

মূল্য ৸৶০ আনা

সংশোধিত সংস্করণ :—
জানুয়ারী, ১৯৫৬

প্রকাশ করেছেন :—
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশবন্ধু বুক ডিপো
৮৪-এ, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬

ছেপেছেন :—
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :—
শ্রীলক্ষ্মী দাস

অন্যান্য ছবি এঁকেছেন :—
শ্রীপ্রভাত কর্মকার

3962

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর 'বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা—দ্বিতীয় খণ্ড' সম্বন্ধে অভিমত—

যশস্বী কথাশিল্পী শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী বলেন :—

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু সুপরিচিত সাহিত্যিক। তাঁর **'বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা—দ্বিতীয় খণ্ড'** পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ কর্তৃক **৮ম শ্রেণীর** আবশ্যিক দ্রুতপাঠ্য হিসাবে অনুমোদিত হওয়ায় অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এর প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বেই (গত বছর) ৭ম শ্রেণীর জন্যে অনুমোদিত হয়েছিল।

আমাদের ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক রচনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এতে অনেক দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রথমতঃ ভাষার দিকে। ভাষা সহজ ও সাবলীল হোলে ছেলে মেয়েরা বই পড়তে আনন্দ পায়। গল্প নিজের থেকেই তাদের মনকে টেনে নিয়ে যায়, শিক্ষক-শিক্ষিকার ভ্রূকুটির আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কোন্ বিষয়ের সম্বন্ধে তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। বলা বাহুল্য, ছোটদের মনকে আকৃষ্ট করবার জন্যে গল্পই সবচেয়ে উপযোগী। গল্প শোনার আকর্ষণ মানুষের জন্মগত। কিন্তু তার জন্যে কিরকম গল্প বাছতে হবে? সে গল্প শুধু তাদের আনন্দই দেবে তা' নয়, সেই সঙ্গে তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের শিক্ষাও দেবে! তাদের মনে নীতিবোধ জাগাবে, তাদের চরিত্র গঠন করবে যাতে তারা ভাবীকালে মহত্তর এবং সুন্দরতর সমাজ গড়তে পারে, তাদের মধ্যে কল্যাণ-বুদ্ধির উন্মেষ হয়।

বস্তুতঃ শিক্ষা বলতে আমি শুধু বানান, ব্যাকরণ এবং শব্দ রচনা-কৌশল বুঝি না। ওসবের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মনের ভিত্তিও যাতে

শক্ত করে, সুন্দর করে এবং স্বাভাবিক করে, সেদিকে বেশি ক'রে দৃষ্টি রাখা দরকার। না হোলে সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু সেই ভিত্তি কেমন ক'রে তৈরি হবে? কি হবে আমাদের ছেলেমেয়েদের আদর্শ? কি হবে লক্ষ্য? সেকথা জানতে গেলে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানতে হবে। সেই ঐতিহ্য আছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্পে এবং বৌদ্ধজাতকের গল্পেও। যখন আমাদের দেশে অক্ষর-পরিচয়ের ক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ ছিল, তখনও মুখেমুখে, গানে, কথকতায় এই সমস্ত গল্পই জাতির চরিত্র গঠন করেছে, তার আদর্শকে স্পষ্ট করেছে এবং সেই আদর্শের জন্যে জাতিকে মহৎ আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করেছে। শহীদের কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হয়েছে, 'শির দিয়া তো সার নেহি দিয়া।'

স্বাধীন ভারতের ছেলেমেয়েদের বড় হয়ে একদিন সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেই পরিচয় করতে হবে। সেই পরিচয় যাতে সত্য হয়, কল্যাণ হয়, সেই জন্যেই সবার আগে জানতে হবে তার নিজের দেশকে তার মহৎ ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে। কারণ, সেই ঐতিহ্যের মধ্যে ভারতের মৃত্তিকার ধর্ম নিহিত রয়েছে। এই ধর্মকে অতিক্রম করার সাধ্য কারও নেই। এর চরিতার্থতাই জাতির চরিতার্থতা।

অনুজ-প্রতিম শ্রীরবীন্দ্রকুমার সহজ সুন্দর ভাষায় **'বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা—দ্বিতীয় খণ্ড'** লিখেছেন। জাতকের গল্প নিয়ে অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রকুমারের রচনার মধ্যে যে মৌলিকতার পরিচয় পেয়েছি, তা' অনবদ্য এবং এবং অননুকরণীয় না ব'লে থাকা যায় না। তাঁর সাহিত্য-সাধনা জয়যুক্ত হোক, এই আমার আন্তরিক কামনা।

ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ বলেন ঃ—

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর **'বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা—দ্বিতীয় খণ্ড'** পড়লাম। খুব ভালো লাগলো। সমগ্র পুস্তকখানির মধ্যে একটা যাদুর স্পর্শ পেলাম। এ রকম সরস এবং প্রাণবন্ত ক'রে জাতকের গল্প লেখা দুরূহ ব্যাপার। এই বইখানি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ এ বছর **৮ম শ্রেণীর** আবশ্যিক দ্রুতপাঠ্যরূপে অনুমোদিত করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ভারতের প্রাচীন সুমহান ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের পরিচিত হওয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষার গৌরব, এটা বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রকুমারের সাহিত্য-সাধনা সার্থক হ'ক, এই আমার আশীর্বাদ।

সূচী



হাজার-হাজার বছর আগে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের শাসনকালে বোধিসত্ত্ব হরিণজন্ম গ্রহণ করেন। ভারী চমৎকার হরিণ—নাম, 'ন্যগ্রোধমৃগরাজ'। পাঁচ শো' মৃগের তিনি দলপতি। মৃগদের সঙ্গে অরণ্যে মহানন্দে বিচরণ ক'রে বেড়ান।

সেই অরণ্যের আর একটি মৃগের নাম—'শাখামৃগ'। এরও একটি স্বতন্ত্র দল আছে। সেদলেও পাঁচ শো' মৃগ। দলের কর্তা—'শাখামৃগ'।

ব্রহ্মদত্ত মৃগমাংসের ভক্ত। যেদিন মৃগমাংস পাওয়া যেত না, সেদিন নানা প্রকার তরি-তরকারী রান্না হ'লেও তাঁর আহার মনোমত হ'ত না। আহার ক'রে তিনি তৃপ্তি পেতেন না। অনেক আহার ক'রেও যেন অনেক কিছু আহার করেন নি, এমনি মনে হ'ত। মৃগমাংসের জন্য ব্রহ্মদত্ত প্রায় প্রত্যহ বহু প্রজাসহ যেতেন মৃগয়ায়। তারা যদি বলতো, রাজার সঙ্গে

মৃগয়ায় যাবো না, নিস্তার পেত না তবু। যেতেই হ'ত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজার সঙ্গে মৃগয়ায় যেতে হ'ত। এতে ফল হ'ত এই যে, প্রজাদের সাংসারিক কাজকর্মে বড়োই ব্যাঘাত ঘটতো। একদিন, দু'দিন না হয় নিজেদের ক্ষতি স্বীকার ক'রে যাওয়া যায়। তাই ব'লে প্রত্যহ? প্রজারা বিরক্ত হয়ে উঠলো। রোজ-রোজ এরকম টানা-পোড়েন আর ভালো লাগে না। তাই, একদিন ওরা সবাই একজোট হয়ে পরামর্শ করলে :—চলো ভাই, রাজার বাগানে হরিণদের আহারের জন্য তৃণ রোপণ এবং পানের জন্য জলের আয়োজন করি। তার পর আমরা বন থেকে হরিণ তাড়িয়ে এনে রাজার বাগানে পুরবো, আর রাজাকে সমস্ত হরিণ দেখিয়ে এই টানা-পোড়েন থেকে রেহাই পাবো।

ওরা করেও তাই। রাজার বাগানে তৃণ রোপণ, কূপ, পুষ্করিণী খনন এই সব কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন ক'রে শেষে 'ন্যগ্রোধমৃগরাজ' ও 'শাখামৃগ' সুদ্ধ সমস্ত হরিণ তারা কৌশলে ধ'রে রাজার বাগানে বন্দী ক'রে রাখলে।

রাজার কাছে তারা আসে। বলে :—মহারাজ, রোজ-রোজ মৃগয়ায় গিয়ে আমাদের কাজকর্মে বড়োই ক্ষতি হয়। আজ আমরা আপনার বাগানে হরিণে-হরিণে একেবারে ছেয়ে দিয়েছি। এখন যতখুশী আপনি হরিণমাংস ভক্ষণ করুন।

ব্রহ্মদত্ত খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন :—তাই নাকি?

প্রজারা বললে ঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। একবার অনুগ্রহ ক'রে বাগানে গিয়ে দেখে আসুন।

ব্রহ্মদত্ত কালক্ষেপ করেন না। তৎক্ষণাৎ আসেন বাগানে। দেখেন—সত্যসত্যই শতশত হরিণ বাগানে রয়েছে।

সেই সোনার মতো রঙের ন্যগ্রোধমৃগরাজ আর সেই সোনার মতো রঙের শাখামৃগ। ওদের দেখতে পান ব্রহ্মদত্ত। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়—ভারী ভালো লাগে।

ব্রহ্মদত্ত আনন্দিতচিত্তে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন ওদের উদ্দেশ ক'রেঃ—তোমাদের আমি অভয় দিলেম। তোমরা নির্ভয়ে আমার উদ্যানে থাকো। তোমাদের কেউ কোনোদিন কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, এই আমি বলে রাখছি।

এরপর কোনোদিন ব্রহ্মদত্ত নিজে, কোনোদিন তাঁর পাচক বাগানে গিয়ে এক-একটি হরিণ শরবিদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শোনবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণেরা প্রাণের ভয়ে এমনি ছুটোছুটি করতো যে, প্রত্যেকদিন একটি হরিণকে মারতে গিয়ে অনেক হরিণই মারা পড়তে লাগলো।

ন্যগ্রোধমৃগরাজ (বোধিসত্ত্ব) এই দুর্ঘটনা অবহিত হলেন। তিনি খুবই চিন্তিত হন। এভাবে যদি আরো কিছুদিন যায়, তাহ'লে অচিরেই সমস্ত হরিণ মারা পড়বে। সুতরাং, এর একটা প্রতিবিধান করতেই হবে।

মনে মনে এই চিন্তা ক'রে মৃগরূপী বোধিসত্ত্ব সেই শাখামৃগের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলেন—দুটি দল থেকে পালা ক'রে

এক-একদিন এক-একটি মৃগ নিজের নিজের দিন অনুযায়ী 'ধর্মগণ্ডিকা'র (যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর হন্তব্য প্রাণীর গ্রীবা রেখে শিরশ্ছেদ করা হয়—যূপকাষ্ঠ) উপর গ্রীবা রাখবে এবং ব্রহ্মদত্তের পাচক সেখানে গিয়ে সেই মৃগের শিরশ্ছেদ করবে। এতে ফল হবে, অনর্থক অন্য সব মৃগেরা মারা পড়বে না।

বোধিসত্ত্বের নির্দেশমত কাজ হয়। যে-মৃগ ধর্মগণ্ডিকার উপর গ্রীবা রাখতো, রাজার পাচক তার-ই শিরশ্ছেদ করতো। অন্য কোনো মৃগের উপর অত্যাচার করতো না।

দিন যায়।

একদিন শাখামৃগের দলভুক্তা একটি সসত্ত্বা (গর্ভিণী) হরিণীর দিন এলো। সে যায় শাখামৃগের কাছে। বলে :—প্রভু, আমি এখন সসত্ত্বা। কিছুদিন পর আমরা একটির জায়গায় দু'টি হবো। পালামত দু'টিই প্রাণ দিতে পারবো। কাজেই এবার আমাকে ছেড়ে দিতে অনুমতি করুন।

শুনে শাখামৃগ ঘাড় নেড়ে দৃঢ়স্বরে বলে :—না, তা হ'তে পারে না। অসম্ভব। তোমার অদৃষ্টের ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। আমি অন্য কোনো মৃগের উপর তোমার পালা চাপাতে পারবো না। নিজেও তোমার জন্য মরতে পারবো না।

হরিণী কিন্তু আশা ছাড়ে না। যায় বোধিসত্ত্বের কাছে। সব কথা খুলে বলে।

বোধিসত্ত্ব আশ্বাস দিয়ে বলেন ঃ—আচ্ছা, তুমি এখন তোমাদের দলে ফিরে যাও। এবার যাতে তোমার জীবন রক্ষা হয়, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

বোধিসত্ত্ব সরাসরি যান পশু-বধক্ষেত্রে। ধর্মগণ্ডিকার উপর নিজের মাথাটি ন্যস্ত ক'রে নীরবে শুয়ে থাকেন।

পাচক আসে যথাসময়ে। বোধিসত্ত্বকে দেখে তার আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ কী, ন্যগ্রোধমৃগরাজ? তাঁকে যে রাজা দিয়েছেন অভয়!

ছুটে আসে পাচক ব্রহ্মদত্তের কাছে। বলে ঃ—মহারাজ, আশ্চর্যের ব্যাপার! আপনি ন্যগ্রোধমৃগরাজকে অভয় দিয়েছিলেন। কিন্তু বধ্যভূমিতে গিয়ে দেখি—সেই মৃগ ধর্মগণ্ডিকার উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। আসুন মহারাজ, দেখবেন আসুন।

ব্রহ্মদত্ত অবাক হয়ে গেলেন ঃ—বলো কী হে? চলো, চলো, শীঘ্র চলো।

ব্রহ্মদত্ত অবিলম্বে পাত্র-মিত্রসহ রথে চ'ড়ে উদ্যানে এলেন। দেখলেন, সত্যই ন্যগ্রোধমৃগরাজ ধর্মগণ্ডিকার উপর মাথা রেখে নীরবে শুয়ে আছেন।

ব্রহ্মদত্ত কোমলস্বরে বলেন ঃ—সখে মৃগরাজ! আমি তো তোমায় অভয় দিয়েছি! তবে তুমি কেন ধর্মগণ্ডিকার উপর মাথা রেখেছো?

তখন ন্যগ্রোধমৃগরাজ বলেন ঃ—মহারাজ, আজ যে হরিণীর প্রাণদান করিবার দিন, সে সসত্ত্বা। সে যখন আমার সাহায্য

প্রার্থনা করলে, তখন দেখলেম, একের প্রাণ রক্ষা করবার জন্য অন্যের প্রাণ বিনাশ ক'রতে পারিনে! কাজেই ভাবলেম, নিজের প্রাণ দিয়েও তার প্রাণ রক্ষা করবো। সেই জন্যই আমি ধর্মগণ্ডিকার উপর মাথা রেখেছি, মহারাজ। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নেই আমার।

শুনে ব্রহ্মদত্ত পুলকিতচিত্তে বলেন ঃ—মৃগরাজ, আজ অপনি যে মৈত্রী, প্রীতি এবং দয়ার পরিচয় দিলেন, তা' মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। আপনি উঠুন। আমি সন্তুষ্ট হয়েই আপনাকে আর সেই হরিণীকে অভয় দিলেম। উঠুন, মৃগরাজ—উঠুন।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব মাথা তোলেন না। যেমন ছিলেন, সেই-ভাবে থেকেই আবার বলেন ঃ—মহারাজ, মাত্র দু'টি মৃগ অভয় পেলে। বাদ-বাকী মৃগদের কি হবে মহারাজ,—তাদের ভাগ্য ?

ব্রহ্মদত্ত সেইভাবেই আবার বলেন ঃ—বাদ-বাকী সমস্ত মৃগদেরও অভয় দিলেম, মৃগরাজ। কিন্তু আপনি উঠুন। আর এভাবে শুয়ে থাকবেন না। উঠুন আপনি।

—সেকথা পরে হবে মহারাজ। আপনার উদ্যানের সব মৃগই অভয় পেলে, কিন্তু, আর সব মৃগদের কি দশা হবে ? বলেন বোধিসত্ত্ব।

—তাদেরও দিলেম অভয়। কিন্তু আপনি আর এভাবে শুয়ে থাকবেন না। উঠুন। উঠুন মৃগরাজ! আর্দ্র কণ্ঠে বলেন ব্রহ্মদত্ত।

বোধিসত্ত্ব বলেন :—সেকথা পরে হবে।...মৃগকুল নিস্তার পেলে—অপর চতুষ্পদের ভাগ্যে কি ঘটবে, মহারাজ?

—তাদেরও দিলেম অভয়। দৃঢ়কণ্ঠে বলেন ব্রহ্মদত্ত।

—কিন্তু পাখীদের গতি কি হবে? জিজ্ঞাসা করেন বোধিসত্ত্ব।

ব্রহ্মদত্ত সেইভাবেই জবাব দেন :—পাখীদেরও অভয় দিলেম।

—জলচরদের কি গতি হবে, মহারাজ? প্রশ্ন করলেন বোধিসত্ত্ব।

ব্রহ্মদত্ত বললেন :—তাদেরও অভয় দিলেম।

রাজা ব্রহ্মদত্তের কাছ থেকে অভয় পেয়ে বোধিসত্ত্ব এইবার সেই ধর্মগণ্ডিকা থেকে মাথা তুললেন। রাজাকে 'পঞ্চশীল'—সদুপদেশ দিয়ে বলতে থাকেন :—মহারাজ, ন্যায়পথে চলুন। মাতাপিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। পুত্রকন্যাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। গৃহী ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। লোক-জন, যে যেখানে আছে—সবাইয়ের সঙ্গে যথাধর্ম ভালো ব্যবহার করুন। এর ফল হবে শুভ। পুণ্য সঞ্চয় হবে আপনার। মৃত্যুর পর আপনি যেতে পারবেন দেবলোকে। কোনো বাধা থাকবে না, মহারাজ!

সেই শাখামৃগের দলভুক্তা সসত্ত্বা হরিণী।

যথাসময়েই সে একটি সুন্দর হরিণ-শাবক প্রসব করে।

দিন যায়। শাবকটি বড়ো হয়। খেলা করতে থাকে শাখামৃগের সঙ্গে। শাবকটির মা এটা লক্ষ্য করে।

একদিন কাছে ডেকে মা বলে ঃ—বাবা, তুমি শাখামৃগের সংসর্গে থেকো না। তুমি এখন ন্যগ্রোধমৃগের দলের সঙ্গে মিশবে। ন্যগ্রোধমৃগের সঙ্গে থেকে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহ'লেও তাতে আমার কোনো দুঃখ হবে না। শাখামৃগ যদি তোমায় দীর্ঘজীবনও দান করে, তবু তার সংসর্গ তুমি ত্যাগ করবে।

রাজা ব্রহ্মদত্তেরই রাজ্য।

রাজার কাছ থেকে অভয় পেয়ে মৃগেরা লোকের বড়োই ক্ষতি করতে থাকে। মৃগেরা শস্য খেয়ে বেড়ায়। রাজার ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। একদিন প্রজারা দলবেঁধে আসে রাজার কাছে। তাদের অভিযোগ জানায়। শুনে রাজা বলেন ঃ—আমি সন্তুষ্ট হয়ে ন্যগ্রোধমৃগকে 'বর' দিয়েছি। আমার রাজ্য যদি রসাতলে যায়, যাক্। কোনো দুঃখ নেই তাতে। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারবো না। তোমরা চলে যাও। আমার রাজ্যের মধ্যে কেউ কোনো মৃগের অনিষ্ট করতে পারবে না।

প্রজারা হতাশ হয়ে চলে আসে।

বোধিসত্ত্বের কানে সেকথা আসে।

অনুচরদের কাছে ডাকেন বোধিসত্ত্ব। বলেন ঃ—আজ থেকে তোমরা লোকের শস্য খেতে পারবে না।

লোকালয়ে সংবাদ পাঠালেন বোধিসত্ত্ব ঃ—কৃষকগণ, তোমরা এখন থেকে ক্ষেতের চারিধারে বেড়া দিও না। শুধু পাতার মালা দিয়ে ঘিরে কার কোন্‌টি ক্ষেত চিহ্নিত ক'রে রেখো।

প্রবাদ আছে—পাতার মালা দিয়ে ক্ষেত ঘেরবার নিয়মটি এইভাবেই দেখা দেয়। কোনো মৃগ কখনো শস্য খাবার লোভে পাতার মালার বেড়া অতিক্রম করে না। এর কারণ হ'ল এই যে, বোধিসত্ত্ব মৃগদের ওটি অতিক্রম করতে নিষেধ করেছিলেন।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ কপিলবস্তুতে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায়—ভগবান গৌতমবুদ্ধ বহুবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে। এক-এক জন্মে এক-একটি রূপ পরিগ্রহ করেন। বৌদ্ধেরা বলেন—এক বা দুই জন্মে কেউ কখনো দেবত্ব লাভ করতে পারে না। বহু জন্মের কঠোর সাধনায় তবে দেবত্ব লাভ করা যায়। বৌদ্ধেরা পূর্বজন্মে এবং পরজন্মে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে—কোটিকল্প জন্ম নিয়ে তবে গৌতম বুদ্ধত্ব বা দেবত্ব লাভ করেছিলেন। যতদিন না কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে, ততদিন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন জন্ম নিয়ে সংসারে আসতে হয়। কিন্তু কর্মও নশ্বর। এরও লয় হয়। কর্মের যখন শেষ হয়, তখন আর পুনর্জন্ম ঘটে না। এরই নাম—নির্বাণ।

বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা বা জাতক, বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের বিভিন্ন ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন জাতিস্মর; তাই নিজের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত তাঁর শিষ্যদের কাছে বর্ণনা করতে পেরেছেন। সর্ববিষয়েই সৎ-শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি, বুদ্ধদেব—নিজের বহু গতজন্মের জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা উপদেশাত্মক। এ থেকে আমরা নিজেদের চরিত্র সংশোধন করতে পারি। এ থেকে আমরা সর্বজীবে দয়াপরবশ হ'তে পারি। এ ছাড়া, ভগবান বুদ্ধ তাঁর জন্মান্তর কথায় তখনকার সমাজের বহু নিখুঁত চিত্র আমাদের চোখে উপর তুলে ধরেছেন। সেগুলি হ'ল এই:—

বণিকেরা জাহাজে চেপে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতেন বাণিজ্য করতে। মহানগরীর অধিবাসিগণ চাঁদা তুলে অনাথ-আশ্রম চালাতেন। অনাথ বালকেরা বিনা মাহিনায় অধ্যাপকের কাছে লেখাপড়া শিখতো। পাঠশালার বালকেরা কাষ্ঠফলকে হাতের লেখা অভ্যাস করতো। অঙ্ক কষতো। তখন ভারতবর্ষের তক্ষশিলা বিদ্যালোচনার সবচেয়ে নাম করা নগর ছিল। শুধু এই নয়। তখনকার সময়ে তক্ষশিলায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। তখন এদেশে দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। শাসন-প্রণালী সাধারণতঃ রাজতন্ত্র ছিল। কিন্তু রাজার সিংহাসন নিরাপদ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হ'লে প্রজারা বিদ্রোহী হ'ত এবং কখনো কখনো রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতো। এই জন্য রাজাকে খুবই

সতর্কতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতে হ'ত। তখন নারীরাও অনেক বিষয়ে পুরুষের পাশে এসে সহযোগিতা করতেন।

ভগবানবুদ্ধ তাঁর অতীত-জন্মের বিবরণীতে সমস্ত প্রাণীদের অনেক কিছু সৎ-শিক্ষার সঙ্গে এও শিক্ষা দিয়েছেন—

মৈত্রী, প্রীতি, অহিংসা এবং শান্তি জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করে।

ভগবানবুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন তাঁর শিষ্যদের প্রাণিহিংসা মহা পাপ, এই সদুপদেশ দিয়ে নিজের একটি গত-জীবনের ঐ কথা বলেছিলেন। ঐ জীবনে ভগবানবুদ্ধ ছিলেন—ন্যগ্রোধমৃগরাজ। আনন্দ ছিলেন—রাজা। দেবদত্ত ছিলেন—শাখামৃগ। শিষ্যেরা ছিলেন—শাখামৃগের অনুচরগণ। এক ভিক্ষুণী ছিলেন—হরিণী। কুমার কশ্যপ ছিলেন—হরিণীর শাবক।



প্রাচীনকালের কথা।

মগধরাজ্যের রাজগৃহ-নগর। মগধরাজের শাসনকাল।

বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে মগধরাজের শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বোধিসত্ত্বের ধন-দৌলতের অবধি ছিল না। কুবেরের ঐশ্বর্য। আশীকোটি মুদ্রা তাঁর সঞ্চিত ছিল। এই বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য লোকে তাঁকে 'শঙ্খশ্রেষ্ঠী' বলতো। ঐ নামেই তিনি জনসমাজে পরিচিত ছিলেন।

বারাণসী-নগরে থাকতেন আর একজন শ্রেষ্ঠী। এঁরও শঙ্খশ্রেষ্ঠীর মতো আশীকোটি মুদ্রা সঞ্চিত ছিল। এঁর নাম—পিলিয়। শঙ্খশ্রেষ্ঠী আর পিলিয়, দু'জনেই দু'জনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কিন্তু ভাগ্য যখন মন্দ হয়, তখন কোথা থেকে যে বিপর্যয় ঘটে, কেউ তা' বলতে পারে না। ঐ বিপুল ঐশ্বর্যশালী

পিলিয় দুরদৃষ্টবশতঃ মহা বিপত্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। ভাগ্য এক সময়ে তাঁকে কুবেরের ঐশ্বর্য দান করেছিল অকাতরে। আবার ভাগ্য-ই তাঁকে করলে পথের ভিখারী।

বিপদে লোকে প্রকৃত বন্ধুকে স্মরণ করেন। পিলিয় আজ বহুদিন পর বিপদে পড়েই স্মরণ করলেন প্রকৃত বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে।

বেরিয়ে পড়লেন পিলিয়। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। পথের পর পথ তাঁরা পায়ে হেঁটে চলেছেন। রাজগৃহ-নগরে যাবেন। সেখানে আছেন শঙ্খশ্রেষ্ঠী। বাল্যবন্ধু, প্রাণের বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠী। মহা বিপদে, চরম বিপর্যয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে সাহায্য করবেন—এমনি বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠী।

শঙ্খশ্রেষ্ঠীর প্রাসাদ তুল্য ভবনে এলেন পিলিয় সস্ত্রীক।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী তাঁদের যথোচিত আদর-যত্ন ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

দিনের পর দিন কাটে।

একদিন শঙ্খশ্রেষ্ঠী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ—

ঃ ভাই পিলিয়, তুমি কি জন্য এতদিন পর আমার কাছে এসেছো, বলোত' ? বেশ লক্ষ্য করছি, তোমার মনে সুখ-শান্তি নেই। সদাই তোমার ভার-ভার মুখ। কি যেন চিন্তা করছো। আসল ব্যাপারটা খুলে বলতে পারো আমাকে ?

পিলিয় বন্ধুর এই উক্তিতে মনে ভরসা পেলেন। অনেক দিন নিজের ভাগ্য-বিপর্যয় বলি-বলি ক'রেও বলতে পারেন নি।

আজ এখন বন্ধুর মুখ থেকে ঐ কথা শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললেন ঃ—

ঃ ভাই, আমার বড়ো বিপদ! আমার যা' কিছু ছিল, সব গেছে। আমি এখন সর্বস্বান্ত। পথের ভিখারী। তুমি যদি এখন আমাকে সাহায্য না করো, তাহ'লে আমার আর কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।

প্রকৃত বন্ধু যিনি, তিনি বন্ধুর বিপদে আন্তরিক ব্যথিত না হয়ে থাকতে পারেন না। শঙ্খশ্রেষ্ঠী পিলিয়ের এই ভাগ্য-বিপর্যয় অবহিত হয়ে নিতান্তই ব্যথিত হয়ে উঠলেন। বন্ধুর হাতছ'টি প্রীতিভরে নিজের একখানি হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। বললেন ঃ—

ঃ তোমার বিপদে আমি যদি সাহায্য না ক'রি, তাহ'লে বৃথা আমার রাজ-ঐশ্বর্য! তুমি বিন্দুমাত্রও চিন্তা ক'রো না। আমি বেঁচে থাকতে তোমার ভাবনা কি ভাই?

এই ব'লে শঙ্খশ্রেষ্ঠী ধনাগার খুলে সেখান থেকে নিজের হাতে পিলিয়কে চল্লিশকোটি মুদ্রা দিলেন। শুধু এই নয়। তাঁর স্থাবর, অস্থাবর, দাস-দাসী প্রভৃতি সমস্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি-ও সমান ছ'ভাগ ক'রে একভাগ দিলেন পিলিয়কে। পিলিয় সেই অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে বারাণসীতে ফিরে গিয়ে পরম সুখেই দিন যাপন করতে লাগলেন।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ নদীর জোয়ার-ভাঁটার মতো। কখনো সুখে মানুষ দিন কাটায় নদীতে জোয়ার আসার মতো।

আবার কখনো নদীতে ভাঁটা আসার মতো সুখ চলে যায়। আসে দুঃখ। শঙ্খশ্রেষ্ঠীর অতুল ঐশ্বর্যের অর্দ্ধভাগ তখনো নিজের কাছে ছিল। কিন্তু সেই ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়ে যেতে দেরী হ'ল না। পিলিয় যেমন কপর্দকশূন্য হয়ে বিপত্তিতে পড়েছিলেন, শঙ্খশ্রেষ্ঠীরও হ'ল সেই অবস্থা। মানুষের অবস্থা কখন কি রকম থাকে, কেউ বলতে পারে না।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী চিন্তা করেন গালে হাত দিয়ে।—তাই তো! এখন, কার কাছে গিয়ে হাত পাতা যায়? কে এই বিপদে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে? চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে যায়—বন্ধু পিলিয়ের কথা। শঙ্খশ্রেষ্ঠী নিজের মনেই বললেন ঃ—আমি তো একবার বন্ধুর মহা-উপকার করেছিলেম। তাকে আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের অর্দ্ধেক দিয়েছিলেম। সে কখনোই আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তার কাছেই যাই।

এই সঙ্কল্প ক'রে শঙ্খশ্রেষ্ঠী সস্ত্রীক পায়ে হেঁটে বারাণসী যাত্রা করলেন। সেখানে এসে স্ত্রীকে বললেন ঃ—

ঃ দেখো, তুমি আমার সঙ্গে রাজপথ দিয়ে হেঁটে গেলে ভালো দেখাবে না। আমি বন্ধুর কাছে গিয়ে, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। যতক্ষণ গাড়ী না পাঠাই, ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা করো।

স্ত্রীকে রাখেন শঙ্খশ্রেষ্ঠী একটি ধর্মশালায়। স্ত্রীকে ধর্ম-শালায় রেখে শঙ্খশ্রেষ্ঠী একাই নগরে এলেন। পিলিয়ের

বাসভবনে উপস্থিত হলেন। একজনকে দিয়ে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন—রাজগৃহ-নগর থেকে আপনার বন্ধু শঙ্খশ্রেষ্ঠী এসেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

লোকটি গিয়ে সংবাদ দেয় পিলিয়কে। কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গে পিলিয় বলেন ঃ—

ঃ তাঁকে এখানে আসতে বল ঃ—

লোকটি শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে পিলিয়ের কাছে নিয়ে আসে।

শঙ্খশ্রেষ্ঠীর মলিন বেশভূষা দেখে পিলিয় তাঁকে সাদর-অভ্যর্থনা জানান্ না। মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ—

ঃ কি মনে ক'রে হে ?

পিলিয় শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে ভদ্রতা ক'রে বসতে পর্যন্ত বললেন না। শঙ্খশ্রেষ্ঠী এতে নিজেকে খুবই অপমানিত মনে করলেন। কিন্তু কী করবেন তিনি ? ভাগ্য-বিপর্যয়ে পড়েছেন। এই অপমানটি তিনি গায়ে তেমন মাখলেন না। বলেন ঃ—

ঃ তোমাকে দেখতে এসেছি ভাই। সেই যে তুমি আমার ওখান থেকে চলে এলে, দীর্ঘদিন হয়ে গেলো তোমার কোনো সংবাদ নেই। মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেলো। ভাবলেম, দেখে আসি একবার আমার বন্ধুটিকে।

পিলিয় একবার শঙ্খশ্রেষ্ঠীর মুখপানে দৃষ্টি ফিরিয়ে চাইলেন। বললেন ঃ—

ঃ এখানে কোথায় বাসা করেছো ?

ঃ এখনো পর্যন্ত বাসাটাসা কিছু করতে পারিনি। আমার স্ত্রী আছেন ধর্মশালায়। সেখানে তাঁকে রেখে সোজা এখানে আসছি। বললেন শঙ্খশ্রেষ্ঠী।

পিলিয় শঙ্খশ্রেষ্ঠীর মনের ভাব বুঝে বিকৃতকণ্ঠে বললেন ঃ—

ঃ এখানে তো তোমার থাকবার সুবিধা হবে না। যেখানে হয় থাকো গে'। আমার সঙ্গে আর দেখা ক'রো না। আমার সময় অল্প। কাজ অনেক। তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে আমার অমূল্য সময় নষ্ট করতে পারিনে।

উঠে পড়েন পিলিয়। ভৃত্যকে ডাকেন। বলেন ঃ—

ঃ এই লোকটাকে চারমুঠো ভুসি দিয়ে বিদায় ক'রে দাও।

ব'লেই তিনি সেই ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অন্যত্র চ'লে যান।

নিদারুণ অপমানে শঙ্খশ্রেষ্ঠীর মুখখানি চাপাক্রোধে লাল হয়ে উঠলো। সেই সময়ে ভৃত্য আসে একটি ধামায় ভুসি নিয়ে।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী নীরবে ভাবেন ঃ—এই অকৃতজ্ঞ পিলিয় আমার কাছ থেকে চল্লিশকোটি মুদ্রা পেয়ে এখন আমাকে দিচ্ছে ভুসি! এ আমি গ্রহণ করবো, না করবো না? যদি গ্রহণ না করি, তাহ'লে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের অপরাধ হবে আমার। যারা মূর্খ এবং নীচ, তারাই কোনো বস্তু অল্প ব'লে গ্রহণ করে না।

সেখানে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে। অতএব, ভুসি গ্রহণ ক'রে আমার সাধ্যমত মিত্রধর্ম রক্ষা করি।

পরিধেয়বস্ত্রের খুঁটে শঙ্খশ্রেষ্ঠী বেঁধে নিলেন সেই চারমুঠো ভুসি। ফিরে আসেন সেই ধর্মশালায়, যেখানে তাঁর জন্যই ব্যস্ততার সঙ্গে অপেক্ষা করছেন তাঁরই স্ত্রী।

স্বামীকে দেখে স্ত্রী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন :—

: এসেছো? বাঁচলেম! আমি তো ভেবে খুন হচ্ছিলেম। তা', সেকথা যাক। বন্ধু তোমায় কি দিলে?

বিষণ্ণমুখে শঙ্খশ্রেষ্ঠী বললেন :—

: চারমুঠো ভুসি দিয়ে বন্ধু বিদায় করেছে। আর কিছুই পাইনি।

স্ত্রী শুনে কেঁদে ফেললেন :—

: তুমি নিলে কেন ঐ তুচ্ছ দান? যে-বন্ধুকে তুমি নিজের ঐশ্বর্যের অর্দ্ধেক অকাতরে দান ক'রে দিয়েছো, সেই বন্ধুর এই কি কৃতজ্ঞতা? এই কি সেই চল্লিশকোটি মুদ্রার প্রতিদান?

বোধিসত্ত্ব (শঙ্খশ্রেষ্ঠী) স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :—

: কেঁদো না। পাছে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়, এই ভয়েই এই তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করেছি। এতে তুমি দুঃখ করছো কেন? দেখো, বন্ধুর দান যতই সামান্য হ'ক, তা' বন্ধুর গ্রহণ করা উচিত। যে সেদান গ্রহণ করে না, সে মৈত্রী-ভাবটি ক্ষুণ্ণ করে। আমার বন্ধু আমাকে ভুসি দিলে। বন্ধুর সম্মান

রাখতে, বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতেই সেই সামান্য বস্তুও আমি গ্রহণ করলেম। বন্ধুত্ব কোনো বুদ্ধিমান লোক নষ্ট করে না। মানুষের আর্থিক-অবস্থা কখনো একভাবে যায় না। কখনো ভালো। আবার কখনো মন্দ। কিন্তু বন্ধুত্ব হ'ল শাশ্বত।

স্ত্রীর কান্না থামে না তবু। তিনি অতশত বুঝতে পারেন না। স্বামীর অপমানে ডুকরে কেঁদে উঠেন।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী (বোধিসত্ত্ব) পিলিয়কে যে-সমস্ত ভৃত্য দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একটি কৃষাণ ছিল। সে ধর্মশালার পাশ দিয়ে কি একটা কাজে যাবার সময় শুনতে পেলে ক্রন্দনধ্বনি। ব্যস্ত হয়ে ভিতরে আসে। দেখতে পায় তার প্রভু আর প্রভুপত্নীকে। কৃষাণ তাড়াতাড়ি ওঁদের পদধূলি নেয়। বিস্ময়ে বলে ঃ—

ঃ আপনারা এখানে কেন ?

শঙ্খশ্রেষ্ঠী তখন সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বলেন।

শুনে কৃষাণ ভরসা দিয়ে বলে ঃ—

ঃ কোনো চিন্তা করবেন না, প্রভু। যা' হবার, তা' হয়েছে। এখন চলুন আপনারা আমার কুটীরে। আমি এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করছি। আপনার অনেক নিমক আমরা খেয়েছি। আমরা দাস বটে, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই।

পরম সমাদরে কৃষাণ ওঁদের নিজের কুটীরে নিয়ে আসে। স্নান করিয়ে ওঁদের খেতে দেয়। তারপর বাইরে বেরিয়ে

আসে। ওর বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে দেয়, ওর আগের প্রভু এবং প্রভুপত্নী এখানে এসেছেন।

শুনে ওরা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

দিন কয়েক পরের ঘটনা।

কৃষাণ অনেকগুলি দাস নিয়ে মগধরাজের প্রাসাদে আসে। চীৎকার ক'রে কৃষাণ বলতে থাকে বারংবার—দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ!

রাজার কানে সেই চীৎকার-ধ্বনি আসে। ওদের সকলকেই ডেকে পাঠান্ নিজের কাছে। ওরা এলে জিজ্ঞাসা করেন :—

: ব্যাপার কি হে?

ওরা তখন রাজাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলে।

রাজা লোক পাঠালেন দু'জনের কাছেই—শঙ্খশ্রেষ্ঠী আর পিলিয়ের কাছে। ওঁদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন।

যথাসময়েই ওঁরা আসেন।

রাজা সর্বাগ্রে শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করলেন :—

: তুমি কি সত্যই পিলিয়কে চল্লিশকোটি মুদ্রা দিয়েছিলে?

শঙ্খশ্রেষ্ঠী বিনয়সহকারে জবাব দিলেন :—

: মহারাজ, আমার বন্ধু পিলিয় যখন নিদারুণ অভাবগ্রস্ত হয়ে রাজগৃহ-নগরে আমার কাছে এসেছিলেন, তখন তাঁকে যে শুধু আমার সঞ্চিত চল্লিশকোটি মুদ্রা দিয়েছিলেন, তা নয়। তার সঙ্গে তাঁকে দান করেছিলেম, আমার স্থাবর, অস্থাবর, দাস-দাসী প্রভৃতি অপর সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক-ভাগ।

এবার রাজা জিজ্ঞাসা করলেন পিলিয়কে ঃ—

ঃ পিলিয়, এ-কথা সত্য ?

ঃ মহারাজ, সত্য। নতমুখে জবাব দিলেন পিলিয়।

রাজা আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—

ঃ আচ্ছা, শঙ্খশ্রেষ্ঠী যখন অভাবে প'ড়ে তোমার কাছে সাহায্যের আশায় এসেছিলেন, তখন তুমি কি ওঁকে যথারীতি সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেছিলে

পিলিয় রাজার এই প্রশ্নের জবাবে কিছু বললেন না। শুধু মাথা নীচু ক'রে বসে রইলেন।

রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—

ঃ তুমি না শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে সামান্য কিছু ভুসি দিয়ে বিদায় করেছিলে ?

পিলিয় এবারও নিরুত্তরে চুপ ক'রে বসে রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে মগধরাজের দেরী হয় না। অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন অনেকক্ষণ। তারপর তাঁর লোকজনদের আদেশ করলেন ঃ—

ঃ তোমরা পিলিয়ের বাড়ী গিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি শঙ্খশ্রেষ্ঠীকে দাও। এই হবে পিলিয়ের অপরাধের শাস্তি।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী তখন হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ—

ঃ মহারাজ, আমি অর্থ চাইনে। আমি যা পিলিয়কে দিয়েছিলেম, শুধু তাই আমাকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করুন।

মগধরাজ তাই আদেশ করেন :—শঙ্খশ্রেষ্ঠীর পূর্বপ্রদত্ত সমস্ত ঐশ্বর্যই দিতে হবে ফিরিয়ে।

শঙ্খশ্রেষ্ঠী (বোধিসত্ত্ব) ফিরে পেলেন তাঁর নিজের দেওয়া সমস্ত ঐশ্বর্য। ফিরে গেলেন সস্ত্রীক রাজগৃহ-নগরে।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় বসে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন :—দেখো, দেবদত্ত কী অকৃতজ্ঞ! সে তথাগতের (বুদ্ধের) মাহাত্ম্য বুঝতে পারলে না।…সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধ সেখানে এলেন। তাঁদের আলোচনার বিষয় অবহিত হয়ে বললেন :—দেখো বাবা, দেবদত্ত পূর্বজন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল। এই ব'লে ভগবানবুদ্ধ ঐ অতীত-কথা ভিক্ষুদের বললেন।

সেই অতীত-জন্মে ভগবানবুদ্ধ ছিলেন—শঙ্খশ্রেষ্ঠী।

সেই অতীত-জন্মে দেবদত্ত ছিলেন—পিলিয়শ্রেষ্ঠী।



বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত।

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে (যাঁরা শাক-সব্জি উৎপাদন ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতেন) জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্বের বয়স বাড়তে তিনি 'কুদ্দাল পণ্ডিত' নামে সকলের কাছে পরিচিত হলেন। মানে, তাঁকে সকলেই 'কুদ্দাল পণ্ডিত' ব'লেই ডাকতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব কোদাল দিয়ে একখণ্ড জমি পরিষ্কার ক'রে তাতে শাক, লাউ, কুমড়া, শশা উৎপাদন করতেন এবং সেই সমস্ত বাজারে বিক্রয় ক'রে অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর সম্বলের মধ্যে ছিল একখানি কোদাল।

দিন যায়। মাস কাটে। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়।

একদিন বোধিসত্ত্ব নিভৃতে চিন্তা ক'রে আপন মনেই বলতে থাকেন ঃ—

সংসারে থেকে আমার কোনো সুখ নেই। অতএব, আমি সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হবো।

যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কাজ। বোধিসত্ত্ব সেই কোদালখানি এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে সংসার ত্যাগ করলেন।

কিন্তু সংসার ত্যাগ করা সত্ত্বেও বোধিসত্ত্বের মন থেকে সেই ভোঁতা কোদালখানির চিন্তা দূর হ'ল না। অপিচ, ঐ কোদালখানির প্রতি লোভ ও মায়া আগের চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠলো। তিনি কোদালখানির জন্য আবার সংসারে এলেন ফিরে।

ছ'বার তিনি সংসারে এলেন।

ছ'বার তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা নিলেন—সন্ন্যাসী হলেন। সেই ভোঁতা কোদালের মায়া তাঁকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবার পথে প্রবল বাধা দিতে লাগলো।

সাতবারের-বার বোধিসত্ত্ব নিজের মনেই আবার বলতে থাকেন—ঃ এই দুষ্ট কোদালের মায়াতেই আমি বারংবার সংসারে আসতে বাধ্য হচ্ছি। এবার এই কোদালকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবো।

বোধিসত্ত্ব এই ব'লে নদীতীরে এলেন। পাছে কোদালখানির পতনস্থান দেখলে ফিরে এসে আবার ওটিকে তুলে আনবার ইচ্ছা হয়, এই ভয়ে বোধিসত্ত্ব নিজের চোখ দু'টি

বন্ধ করলেন। তারপর কোদালখানির বাঁট ধ'রে কোদালখানি মাঝনদীতে নিক্ষেপ করলেন। পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনবার সিংহনাদ করলেন :—

: আমি জিতেছি, আমি জিতেছি, আমি জিতেছি।

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁর বিদ্রোহী প্রজাদের দমন ক'রে সেই পথ দিয়ে ফিরছিলেন। এমন সময় তিনি বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি শুনতে পেলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁর সঙ্গের অনুচরদের বললেন :—

: ঐ লোকটা 'জিতেছি জিতেছি' বলছে। কে আবার জয়লাভ করলো? যা হ'ক, লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো তো!

অনুচরেরা রাজার আদেশ পালন করে।

নিয়ে আসে তারা বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে।

ব্রহ্মদত্ত তখন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করেন—

: ভদ্র, আমি যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে আমার রাজধানীতে ফিরছি। তুমি আবার কিসে জয়লাভ করলে বলো তো?

শুনে বোধিসত্ত্ব স্মিতমুখে বলেন :—

: মহারাজ, আমাদের মনের মধ্যে অনেক দুষ্ট রিপু আছে। তাদের যদি জয় করা না যায়, তাহ'লে সবই বৃথা। আপনি যুদ্ধ ক'রে পৃথিবী জয় করুন না কেন, তাতে সত্যকারের কোনো কাজ-ই হবে না। মহারাজ, আজ আমি লোভ দমন ক'রে রিপুজয়ী হয়েছি।

এই কথা বলতে বলতে বোধিসত্ত্ব সেই মহানদীর দিকে অপলক চক্ষে চেয়ে রইলেন এবং কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকতে থাকতে দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন। রাজাকে উপদেশ দিলেন—যে জয়ের পিছনে পরাজয়ের ভয় আছে, সে জয় নিষ্ফল। কিন্তু যে জয়ের মধ্যে পরাজয় নেই, সে জয় সত্যকারের জয়।

বোধিসত্ত্বের এই উপদেশ শুনে রাজার মন থেকে মোহ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি দূর হয়ে যায়। রাজ্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মায়। সর্ব-ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবার তীব্র বাসনা জাগে। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করেন—প্রভু, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

বোধিসত্ত্ব শান্ত-দীপ্তকণ্ঠে বলেন—মহারাজ, আমি এখন হিমাচলে গিয়ে তপস্বীভাবে বাস করবো।

রাজা পরম উৎসাহে বলেন ঃ—

ঃ তবে আমিও সন্ন্যাসী হয়ে আপনার সঙ্গে যাবো।

ঃ উত্তম। তবে আসুন মহারাজ। বলেন বোধিসত্ত্ব।

রাজা বোধিসত্ত্বের সঙ্গে চলতে থাকেন।

রাজাকে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যেতে দেখে রাজার সৈন্য-সামন্ত এবং অন্যান্য অনুচরেরাও রাজার পিছন পিছন যেতে থাকেন।

ওদিকে বারাণসীর অধিবাসিগণ যখন শুনলেন—কুদ্দাল পণ্ডিতের উপদেশবলে ব্রহ্মদত্ত সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর সঙ্গে চলে গেছেন, এবং রাজার সৈন্য-সামন্তও তাঁর সঙ্গে গেছেন, তখন তাঁরাও ভাবলেন—আমরা আর ঘরে থেকে কি করবো?

এরপর দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ বারাণসী-নগর থেকে সমস্ত অধিবাসী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ জনস্রোত বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিমাচলে প্রবেশ করেন।

স্বর্গে দেবরাজ শক্রের (ইন্দ্র) আসন টলে উঠলো। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন—কুদ্দাল পণ্ডিত মহা পবিত্র কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এতগুলি লোকের বাসস্থানের কি করা যায় ভেবে তিনি তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠালেন। বিশ্বকর্মা তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন :—

: কুদ্দাল পণ্ডিত মহা পবিত্র কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি এখন-ই হিমাচলে গিয়ে দৈবশক্তিতে সুদীর্ঘ আশ্রম তৈরী করো।

বিশ্বকর্মা যথোচিত সম্মান দেখিয়ে বিনয়সহকারে বললেন :—

: আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি এখন-ই আপনার আদেশমত কাজ করছি।

এই ব'লে বিশ্বকর্মা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বকর্মা দেবরাজের আদেশমত আশ্রম তৈরী করলেন। শুধু এই নয়। আশ্রমে পর্ণশালাও তৈরী করলেন। সেখান থেকে হিংস্র পশু, পক্ষী এবং রাক্ষসদেরও বিতাড়িত করলেন। চারিদিকে চারিটি 'এক পদিক মার্গ' (সঙ্কীর্ণ পথ) প্রস্তুত ক'রে স্বস্থানে ফিরে গেলেন।

কুদ্দাল পণ্ডিত (বোধিসত্ত্ব) সকলকে নিয়ে যথাসময়ে হিমাচলে এলেন এবং নূতন আশ্রমে প্রবেশ করলেন। বিশ্বকর্মা সন্ন্যাসীদের ব্যবহার করবার উপযোগী কুটীর এবং বহু দ্রব্য তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। বোধিসত্ত্ব আগে নিজে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তারপর অনুচরদের প্রব্রজ্যা দান করলেন। আশ্রম ভাগ ক'রে কে কোন্ অংশে থাকবেন—তারও নির্দেশ করলেন।

এইভাবে বারাণসীর অধিবাসিগণ সমস্ত পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য পরিহার ক'রে বোধিসত্ত্বের কৃপায় এবং পবিত্রতায় দেবলোকে বাস করবার উপযুক্ত হলেন।

চিত্রহস্ত সারীপুত্র শ্রাবস্তী-নগরের একটি ভদ্রবংশীয় যুবক। এঁর প্রধান কাজ ছিল, লাঙ্গল দিয়ে জমিতে চাষ করা। তখনকার সময়ে ভদ্রবংশীয় যুবকদের স্বহস্তে চাষ করা কোনো দোষের বা নিন্দার বস্তু ছিল না। এ কাজটিকে তাঁরা বিশেষ সম্মান দিতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

যা হ'ক, হলকর্ষণ করবার পর—বাড়ী ফেরবার পথে চিত্রহস্ত সারীপুত্র ভিক্ষুদের আশ্রমে এলেন। এসে একজন ভিক্ষুর পাত্র থেকে অমৃত-সমান খাদ্য আহার ক'রে পরম তৃপ্তি লাভ করলেন। উনি তখন আপন মনেই বললেন :—আমি দিবারাত্রি নিজের হাতে সমস্ত কাজ করি, অথচ কখনো এমনি সুস্বাদু খাদ্য পাইনি। এঁরা ভিক্ষু হয়েছেন। সেইজন্য এমনি খাদ্য পান।

আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তাহ'লে আমিও এমনি অমৃত-সমান খাদ্য পাবো।

সেই যুবকের আহার্য-লোভ এমনি প্রবল হয়ে উঠলো যে, তিনি সেই লোভে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। প্রায় মাস দুই, তিন একমনে ধর্মচিন্তা করলেন। কিন্তু আর পারলেন না। রিপু সংযত করা দূরে থাক, তিনি রিপু-পরতন্ত্র হয়ে উঠলেন। লোভ, মোহ—তাঁর প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি আর ভিক্ষুদের সঙ্গে থাকতে পারলেন না। সঙ্ঘ-ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এলেন। সঙ্ঘ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসে তাঁর অন্নকষ্টের অবধি রইলো না। এই অন্নকষ্ট দূর করবার জন্য তিনি আবার সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন।

ছ'বার যুবকটি সন্ন্যাসী হলেন।

ছ'বার তিনি সংসারী হলেন।

সাতবারের-বার যুবকটি আবার সন্ন্যাসী হলেন। এবার তাঁর চিত্ত অনেকটা শান্ত হয়েছে। রিপুগুলোকে বশ করবার মতো কিছুটা শক্তি অর্জন করেছেন। ভিক্ষুদের সঙ্গে থেকে ভিক্ষুধর্ম আবৃত্তি করতে করতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে 'অর্হত্ত্ব' লাভ করলেন।

একদিন যবকটির ভিক্ষুবন্ধুরা যুবকটিকে পরিহাস ক'রে বললেন ঃ—

ঃ কি হে ভায়া, তোমার মনের রিপুগুলো এখনো কি তোমাকে আগের মতো উত্যক্ত করে ?

যুবকটি উত্তর দেন ঃ—

ঃ না। সংসারের কোনো লোভ, মোহ আর আমাকে উত্যক্ত করে না। মনের রিপুগুলোকে আমি এখন ভিক্ষুধর্মের প্রভাবে জয় ক'রে অর্হত্ত্ব লাভ করেছি।

ধর্মসভায় একদিন চিত্রহস্ত সারীপুত্রের অর্হত্ত্ব-লাভকে কেন্দ্র ক'রে ভিক্ষুরা আলোচনা করছেন, এমন সময় ভগবান গৌতম বুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলেন। ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় অবহিত হয়ে স্মিতমুখে বললেন—ঃ দেখো বাবা, বিষয়াসক্ত লোকের মনে লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুগুলো বড়োই উত্যক্ত করে। এগুলোকে সংযত ক'রে স্থিরচিত্ত হওয়া বড়োই কঠিন। কিন্তু যে ব্যক্তি রিপুগুলোকে যখন-ই হ'ক না কেন জয় করতে পারে, সে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়। তোমরা চিত্রহস্ত সারীপুত্রকে ছ'বার সন্ন্যাসী হয়ে, ছ'বার সংসারী হয়েছিল ব'লে উপহাস করছো, কিন্তু উপহাস করা উচিত নয়। মন বড়ো সাংঘাতিক বস্তু। একে নিজের বশে আনা খুবই কঠিন। সামান্য লোকের কথা দূরে থাক, পণ্ডিতেরা পর্যন্ত মনের দুর্বলতাকে সহজে জয় করতে পারেন না।

এই ব'লে ভগবানবুদ্ধ তাঁর একটি অতীত-জন্মের ঐ বৃত্তান্ত তাঁর শিষ্যদের কাছে বললেন। ঐ অতীত-জন্মে কুদ্দাল পণ্ডিত ছিলেন ভগবানবুদ্ধ। আনন্দ ছিলেন—রাজা ব্রহ্মদত্ত।



বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করলেন।

তখন ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা।

রাজপুত্র যেমন বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে পরমযত্নে লালিত-পালিত হন, বোধিসত্ত্বও তেমনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন ষোল বছর, তখন তিনি নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করলেন।

নগরে ছ'টি দানশালা প্রতিষ্ঠা করলেন বোধিসত্ত্ব। এইসব দানশালায় তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন।

বারাণসী-নগরে তখন 'প্রত্যেক-বুদ্ধ'রা এক সপ্তাহকাল উপবাসী থাকবার পর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে লোকের দ্বারস্থ হতেন। একদিন এক 'প্রত্যেক-বুদ্ধ' এক সপ্তাহকাল উপবাসী থেকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বোধিসত্ত্বের দ্বারস্থ হলেন। তখন সকালবেলা। বোধিসত্ত্বের প্রাতঃরাশের জন্য নানারকম সুখাদ্য ভৃত্যেরা তাঁর

(বোধিসত্ত্ব) কাছেই নিয়ে আসছিল। এমনি সময়ে সেই 'প্রত্যেক-বুদ্ধ'কে বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন। বোধিসত্ত্ব তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। ভৃত্য পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন :—

: আর্যের হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসো।

দুরাত্মা 'মার' সবসময়েই বোধিসত্ত্বের সাধনার পথে, তপস্যার পথে বাধা দেবার প্রবল চেষ্টা করেছে। সুযোগ পেলেই সে বোধিসত্ত্বকে নানারকম দুঃখ-কষ্ট দিয়ে সৎ-পথ থেকে স্খলিত করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে সফল হয়নি। অবশেষে দেখা গেছে—'মার' বোধিসত্ত্বের কাছে পরাজিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল :—

বোধিসত্ত্বের অভিপ্রায় জেনে 'মার' অন্তরীক্ষে অবস্থান ক'রে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলো। ভাবলে :—এই 'প্রত্যেক-বুদ্ধ' সাতদিন নির্জলা উপবাসী থেকে এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, আজ যদি অনাহারে থাকেন, তাহ'লে মৃত্যু অনিবার্য। এঁকে হত্যা করাই দরকার। সুতরাং, বোধিসত্ত্ব যাতে এঁকে খাদ্য দিতে না পারেন, তার ব্যবস্থা আমি করছি।

এই দুরভিসন্ধিতে 'মার' তখনি মায়াবলে বোধিসত্ত্বের বাসভবনে প্রায় আশীহাত বিস্তৃত একটি প্রকাণ্ড প্রজ্বলিত কূপের সৃষ্টি করলে। অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বেরিয়ে এক ভয়াবহ দৃশ্যের সূচনা

করলে। মনে হ'ল—অগ্নিদেবতা বুঝি আজ সমস্ত ভবনটাই গ্রাস ক'রে ফেলবেন।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে যে-ভৃত্য প্রত্যেক-বুদ্ধের হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র আনতে যাচ্ছিল, সে বোধিসত্ত্বের কাছে ফিরে এলো। তার চোখ-মুখে উত্তেজনা এবং ভীতির ভাবটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বোধিসত্ত্ব তাকে ঐ অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন :—

: কি হ'ল? তুমি ফিরে এলে যে?

: প্রভু, যাবার পথে একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে ধক্ ধক্ ক'রে আগুনের শিখা সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই আমি বাধ্য হয়েছি ফিরে আসতে।

বোধিসত্ত্ব ক্ষণকাল মৌন থেকে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন :—

: না। তোমার দ্বারা একাজ হবে না। আচ্ছা, অন্য ভৃত্যদের ডাকো। তারা যাবে।

বোধিসত্ত্বের আদেশে অন্যান্য ভৃত্যেরা সেই প্রত্যেক-বুদ্ধের কাছে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। আগুনের ভয়ে তারা যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়ে যায়।

বোধিসত্ত্ব এবার চিন্তিত হয়ে উঠলেন। নীরবে ব'সে চিন্তা করতে করতে তাঁর দিব্যচক্ষুর দৃষ্টিতে সবই পরিষ্কার হয়ে

ভেসে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন—পাপিষ্ঠ 'মার' এই অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। বোধিসত্ত্ব হঠাৎ একসময়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন :—

: আজ দেখছি দুষ্টমতি 'মার' আমার দানের অন্তরায় হয়েছে। আচ্ছা আমি দেখবো, শত-সহস্র 'মার' আমার কী করতে পারে ! 'মারের' ক্ষমতা, আর আমার সাধনা—এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি বড়ো, আজ তার-ই পরীক্ষা হবে।

বলতে বলতে বোধিসত্ত্ব হাতের কাছের অন্নপাত্রটি তুলে নিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে অগ্নিকুণ্ডের একেবারে ধারে এসে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইলেন। 'মার'কে পেলেন দেখতে। উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন :—

: কে তুমি ?

: আমি 'মার'। গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দেয়, 'মার'।

: তুমি-ই এই অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করেছো ? জিজ্ঞাসা করলেন বোধিসত্ত্ব।

'মার' জোর দিয়ে বললে :—

: হ্যাঁ, আমি-ই এই অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করেছি।

: কিন্তু কেন ? প্রশ্ন করলেন বোধিসত্ত্ব আবার।

'মার' কর্কশকণ্ঠে জবাব দিলে :—

: তোমার সৎ-কাজে বাধা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। শুধু এই নয়। প্রত্যেক-বুদ্ধকে হত্যা করাও আমার ইচ্ছা।

শুনে বোধিসত্ত্ব হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। তাচ্ছিল্যের হাসি। হাসি থামলে অবিচলিতকণ্ঠে বললেন :—

: বটে! এমন কথা! কিন্তু তোমাকেও ব'লে রাখছি—আমার সৎ-কাজে, দানে, তোমাকে কিছুতেই বাধা দিতে দেব' না! এই প্রত্যেক-বুদ্ধের জীবননাশও তুমি করতে পারবে না। আজ দেখা যাবে—আমার প্রভাব বেশী, না তোমার ক্ষমতা বেশী!

এরপর বোধিসত্ত্বকে সেই অগ্নিকুণ্ডের প্রজ্বলিত শিখার সুমুখে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। হাতে তাঁর সেই ভোজ্য-পূর্ণ পাত্র। তিনি সেই 'প্রত্যেক-বুদ্ধ'কে উদ্দেশ ক'রে ভক্তি এবং শ্রদ্ধাসহকারে দৃঢ়স্বরে বলতে লাগলেন :—

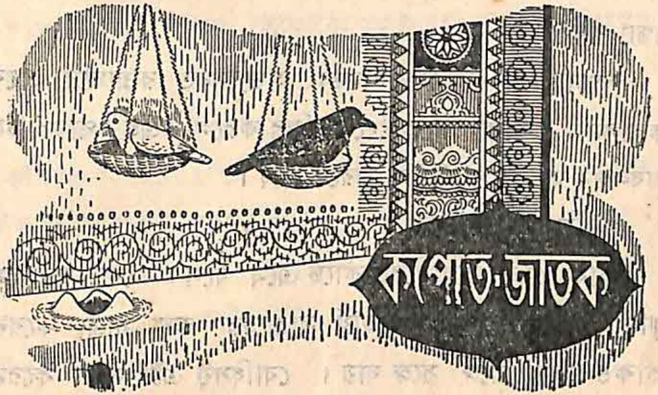
: ভগবন্ প্রত্যেক-বুদ্ধ, এই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আমার যদি মৃত্যুও হয়, সেও ভালো; তবু আমি ফিরবো না। শুধু আমার এই মিনতি—আপনার জন্য যে আহার্য এনেছি, তা' গ্রহণ করুন।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব নির্ভীকচিত্তে সেই ভয়াবহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার উপর পা' রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে অতীব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। সেই আশীহাত বিস্তৃত অগ্নিকুণ্ডের তলদেশ থেকে একটি অপূর্ব মহাপদ্ম ধীরে ধীরে উঠে এলো আপনা-আপনি। বোধিসত্ত্ব সেই অপূর্ব মহাপদ্মের উপর দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে পাত্রের ভোজ্য ঢেলে দিলেন সেই 'প্রত্যেক-বুদ্ধের' পাত্রে।

'মারের' চোখের উপর এই ঘটনা ঘটলো। অথচ, 'মার' কিছুই করতে পারলে না। এমনিভাবে পরাজিত হয়ে 'মার' বিষণ্ণমুখে যথাস্থানে ফিরে গেলো।

বোধিসত্ত্ব জয়-উদ্ভাসিতমুখে সেই অপূর্ব মহাপদ্মের উপর দাঁড়িয়ে সবাইকে 'শীলব্রত' শিক্ষা দিলেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন নানারকম সৎ-কাজ করতেন। দেহ-অবসানের পর কর্ম-অনুরূপ ফললাভ করবার জন্য লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

ভগবানবুদ্ধ জেতবনে একদিন তাঁর ঐ অতীত-জন্মের কথা বলেছিলেন তাঁর শিষ্য অনাথপিণ্ডদকে। ভগবানবুদ্ধ তখন ছিলেন বারাণসীর সেই শ্রেষ্ঠী।



বারাণসীর তখন রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত।

বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে পারাবতরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বারাণসীর অধিবাসিগণ তখন পুণ্যকামনায় পাখীদের সুখ-সুবিধার জন্য ঝুড়ি তৈরী ক'রে স্থানে স্থানে ঝুলিয়ে রাখতো। বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচকও রান্নাঘরে ঐরকম একটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে রেখেছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়ির মধ্যে থাকতেন। প্রতিদিন প্রভাতবেলায় তিনি আহারের অন্বেষণে ঝুড়ি থেকে উড়ে বাইরে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যাবেলা। ফিরে এসে সেই ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে থাকতেন।

একদিন একটি কাক ঐ রান্নাঘরের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাছের গন্ধ পেলে। তার লোভীমন মাছ খাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। কি কৌশলে রান্নাঘরে প্রবেশ ক'রে মাছ খাবে, সেই চিন্তা করতে করতে সে রান্নাঘরের কাছাকাছি

একটি স্থানে গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলো সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সন্ধ্যাবেলা বোধিসত্ত্ব নিত্য অভ্যাসমত রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। কাক তাঁকে দেখে স্থির করলে—এই পায়রাটিকে অবলম্বন ক'রেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

পরদিন প্রভাতবেলা।

কাক সেই রান্নাঘরের কাছে এসে বসে। বোধিসত্ত্ব সেই ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে আহার্য সংগ্রহের জন্য যাত্রা করেন। কাকও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়। বোধিসত্ত্ব এটা লক্ষ্য করেন। বলেন :—

: ভদ্র, তুমি আমার সঙ্গে চরছো কেন?

শুনে কাক বলে :—

: প্রভু, আপনার চাল-চলন আমার বড়ো ভালো লাগছে। আমি স্থির করেছি—এখন থেকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো।

বোধিসত্ত্ব বিস্ময়ে বললেন :—

: সে কি! আমার খাদ্য এক, তোমার খাদ্য আর এক। আমার অনুচর হ'লে তোমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

কাক বলে :—

: প্রভু, আপনি যখন আপনার খাদ্য অন্বেষণ করবেন, তখন আমিও আমার নিজের খাদ্য অন্বেষণ করবো এবং সর্বদা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো।

বোধিসত্ত্ব কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেন :—

: বেশ কথা ! কিন্তু, তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

কাক ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে :—

: আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই থাকবো !

কাককে সাবধান ক'রে দিয়ে বোধিসত্ত্ব বিচরণ করতে করতে তৃণবীজাদি আহার করতে থাকেন।

কাক ওদিকে গোময় থেকে কীট-পতঙ্গ খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে। ওর এতে পেট ভ'রে যায়। আসে বোধিসত্ত্বের কাছে। বলে :—

: প্রভু, আপনি দেখছি বহুক্ষণ ধ'রে আহার করেন। কিন্তু অতিশয় ভোজন করা ভালো নয়।

বোধিসত্ত্ব সেকথার কোনো জবাব দিলেন না। দিনের আলো শেষ হয়ে সন্ধ্যা পৃথিবীতে নেমে আসছে। এইবার তিনি নিজের বাসার দিকে ফিরলেন।

বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে কাকও আসে রান্নাঘরে। পাচক ভাবে—পায়রাটি একে সঙ্গে করে এনেছে, এর জন্যও ঝুড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া যাক।

যেমন সঙ্কল্প, তেমনি কাজ।

পাচক কাকের জন্যও একটি ঝুড়ি রান্নাঘরে ঝুলিয়ে দেয়। কাক সেই ঝুড়িতে গিয়ে বসে। বোধিসত্ত্ব আর কাক পাশাপাশি থাকে।

দিন যায়।

একদিন শ্রেষ্ঠী বাজার থেকে বিস্তর মাছ-মাংস কিনে আনলেন। পাচক সেই মাছ-মাংস রান্নাঘরের নানাস্থানে ঝুলিয়ে রাখলে। কাক বসে বসে সবই দেখলে। দেখে দেখে ওর লোভের আর অবধি রইলো না। সে তখনি স্থির ক'রে ফেললে, কাল সে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে চরতে যাবে না। এখানেই থাকবে। মাছ-মাংস তাকে খেতেই হবে। কিন্তু, একটা মতলব করা চাই।

মতলব ঠিক ক'রে ফেলে কাক।

সারারাত্রি সে অসুখের ভাণ ক'রে আর্তনাদ করতে থাকে। ক্রমে রাত্রি কেটে গিয়ে ঊষার আলো দেখা দেয় আকাশে। বোধিসত্ত্ব বললেন কাককে ঃ—

ঃ বন্ধু, চলো এবার।

কাক কৃত্রিম আর্তনাদ করতে করতে বললে ঃ—

ঃ প্রভু, আজ আমার যাবার ক্ষমতা নেই। আজ আপনি একাই যান। আমার উদরে বড়ো ব্যথা হয়েছে।

বোধিসত্ত্ব কাকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারেন। বলেন ঃ—

ঃ কাকের যে ঐ ব্যামো হয়, তা তো কখনো শুনিনি বাপু! কাক রাত্রিবেলা প্রতিপ্রহরে নাকি এক-একবার ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন হয়ে পড়ে। আমার মনে হচ্ছে—তুমি নিশ্চয় মাছ-মাংস খাবার জন্য লালায়িত হয়েছো। তুমি আমার সঙ্গে চলো। দেখো, মানুষের খাদ্য তোমার পক্ষে অখাদ্য।

মানুষের খাদ্য তোমার পক্ষে পরিপাক করা অসম্ভব। এই লোভের বশবর্তী হ'য়ো না। চলো আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে গিয়ে তোমার উপযোগী খাদ্য তুমি অন্বেষণ ক'রে নেবে।

কুমতলবী কাক পারাবতরূপী বোধিসত্ত্বের সদুপদেশ কানে নেয় না। বলে ঃ—

ঃ প্রভু, আমি আজ যেতে পারবো না। আপনি আজ একাই যান।

বোধিসত্ত্ব কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হয়ে বললেন ঃ—

ঃ ভালো। কিন্তু সাবধান। লোভের বশবর্তী হয়ে যেন ঐ মাছ-মাংস আহার করতে যেও না।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব নিজের আহার সংগ্রহ করবার জন্য সেই ঝুড়ি থেকে উড়ে গেলেন।

পাচক মাছ-মাংস দিয়ে নানারকম তরি-তরকারী রাঁধতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর রাঁধবার পাত্রগুলো থেকে বাষ্প নির্গত করবার জন্য পাত্রগুলোর মুখ একটু খুলে দিয়ে একটা পাত্রের উপর 'পরিসৃসাবানকরোটি' (ঝোল প্রভৃতি ছাঁকবার জন্য এক রকম বড়ো পাত্র) রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে গায়ের ঘাম কাপড় দিয়ে মুছতে লাগলো। এই অবসরে কাক ঝুড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে দেখলে—পাচক বাইরে বেরিয়ে গেছে। তখন দুষ্ট কাক ভাবলে ঃ—মাছ-মাংস খাবার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে। একটা বড়ো মাংসের টুক্‌রা খাই, না একটা ছোটো মাংসের টুক্‌রা খাই ? ছোটো মাংসের টুক্‌রা

খেলে পেট শীঘ্র ভরবে না। তার চেয়ে বরং একটা বড়ো মাংসের টুক্‌রা নিয়ে ঝুড়ির মধ্যে বসে খাওয়া সবচেয়ে ভালো।

এই ভেবে লোভী কাক তৎক্ষণাৎ ঝুড়ি থেকে উড়ে গিয়ে সেই 'পরিস্‌সাবানকরোটি'র উপর গিয়ে বসতেই ঝনাৎ ক'রে একটা বিশ্রী শব্দ হ'ল। পাচক রান্নাঘরের পাশেই ছিল। শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ভিতরে এলো। কাককে ঐ অবস্থায় দেখে তার সর্বশরীর রাগে রিরি ক'রে উঠলো। চীৎকার ক'রে বললে :—

: ধূর্ত কাক মাংস খেতে এসেছে। আমার প্রভুর জন্য যে-মাংস রেঁধেছি এত কষ্ট ক'রে, তা ও খেতে চায়? আশা দেখে আর বাঁচিনে! দাঁড়া তুই! তোর লোভের সাজা আমি এখুনি দিচ্ছি।

এই ব'লে পাচক কাকের দেহ থেকে পালকগুলি একটি একটি ক'রে তুলে ফেল্‌লে। তারপর আদার সঙ্গে লবণ ও জীরা বেটে তা' টক্ ঘোলের সঙ্গে মিশিয়ে সেটা বেশ জপ্‌-জপে ক'রে কাকের সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিলে। মাখিয়ে দিয়ে সেই অবস্থায় কাককে তার-ই ঝুড়ির মধ্যে ফেলে রাখলে। দুষ্ট কাক যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করতে করতে আর্তনাদ করতে লাগলো।

ওদিকে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বোধিসত্ত্ব অভ্যাসমত ফিরে এলেন। ফিরে এসেই দেখলেন কাকের দুরবস্থা। মনে মনে

বললেন ঃ—লোভী কাক আমার উপদেশ না শুনে এমনি অবস্থায় পড়েছে। যে-বন্ধু, বন্ধুর ভালোটাই চায়, সে-বন্ধু হিতপরায়ণ বন্ধু। প্রকৃত বন্ধু সে। কিন্তু যে স্বেচ্ছাচারী, সে প্রকৃত বন্ধুর কথায় কর্ণপাত করে না। প্রকৃত বন্ধুর কথা না শোনার জন্য সে বিপদে পড়ে। স্বেচ্ছাচারী কাককে আমি সদুপদেশ দিয়েছিলেম। কিন্তু ও সেই উপদেশ শুনলে না। সেই জন্যই ওর এমনি অবস্থা হ'ল।

বোধিসত্ত্ব সেইস্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে গেলেন।

কাকও সেইস্থানেই তখুনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। পাচক তাকে ঝুড়িসুদ্ধ আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার যথাস্থানেই ফিরে এলো।

ভগবানবুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে গিয়ে একটি ভিক্ষুকে দেখিয়ে বলেন ঃ—

ঃ গুরুদেব, এই ভিক্ষু বড়ো লোভী।

ভগবানবুদ্ধ তখন সেই লোভী ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ—

ঃ বাবা, একথা কি সত্য ?

ভিক্ষুটি তখন নতমস্তকে ধীরে ধীরে বলেন ঃ—

ঃ গুরুদেব, একথা সত্য। আমার লোভটা বেশী।

শুনে ভগবানবুদ্ধ বলেন ঃ—

ঃ শুধু এজন্মে নয়। তোমার এক অতীত-জন্মেও তুমি অত্যন্ত লোভী ছিলে। তোমার লোভের জন্য তুমি প্রাণ হারিয়েছিলে অসময়ে। তোমার দোষের ফলে, যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা নিজেদের আবাস ছেড়ে অন্যত্র গিয়েছিলেন।

এই কথা বলার পর, ভগবানবুদ্ধ তাঁর অতীত-জন্মের ঐ ঘটনাটি বললেন।

তখন ভগবানবুদ্ধ ছিলেন—পারাবত।

তখন ভিক্ষুটি ছিলেন—সেই দুষ্ট কাক।



বোধিসত্ত্ব বারাণসী-নগরে একজন নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। প্রায় পাঁচ-শো' শিষ্য তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতো। তখন বারাণসীর অধিবাসীরা গরীব বালকদের ভরণ-পোষণের এবং শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন। বালকদের খাওয়া, থাকা ও বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত ভার তাঁরা নিতেন। এজন্য তাদের (গরীব বালকদের) টাকা-পয়সা দিতে হ'ত না।

এই সংবাদ পেয়ে মিত্রবিন্দক নামে একটি বালক নানাদেশ ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছল' বারাণসীতে। বোধিসত্ত্বের কাছে এলো। বোধিসত্ত্বের কাছে সে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলো। বিনা-বেতনেই বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগলো। শুধু এই নয়, তখনকার সমাজের রীতি অনুযায়ী বোধিসত্ত্ব মিত্রবিন্দককে দীন-দরিদ্র জেনে তার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু

এই মিত্রবিন্দকের স্বভাব মোটেই ভালো ছিল না। সে কেবল তার সহপাঠীদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতো। তাদের সঙ্গে হাতাহাতি করতেও সে দ্বিধাবোধ করতো না। আজ কার হাতের আঙুল দিলে ভেঙ্গে। কাল একজনের নাকে ঘুষি মেরে নাক দিলে ফাটিয়ে। পরশু আবার হয়তো দেখা গেলো,—দু'জন সহপাঠীর মেরুদণ্ডে চপেটাঘাত ক'রে তাদের শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে। এমনি ধারা বিশ্রী কাণ্ড প্রায় প্রত্যহই ঘটতে লাগলো। গুরুর হাজার সাজা, হাজার ভৎ´সনা সে ভ্রূক্ষেপ করতো না। এই দুরন্ত এবং অসভ্য ছেলেটির জন্য বোধিসত্ত্বের পাঠশালার খুবই অপযশ হ'তে লাগলো। বোধিসত্ত্ব নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়ে তাকে ভালো করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সদুপদেশ কোনো কাজেই লাগলো না। মিত্রবিন্দক গুরুর উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে একদিন রাত্রে সকলের অগোচরে আশ্রম ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলো।

বোধিসত্ত্বের আশ্রম থেকে পালিয়ে এসে দুষ্ট মিত্রবিন্দক এদেশ-ওদেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কোথাও আর আশ্রয় পায় না।

এমনি ক'রে অনেকদিন কেটে যায়।

একদিন সে 'প্রত্যন্ত গ্রামে' (রাজ্যের সীমা সন্নিহিত গ্রামে) এসে উপস্থিত হয়। এখানে মজুরের কাজে লেগে গিয়ে কোনোমতে জীবিকা অর্জন করতে থাকে।

মিত্রবিন্দকের বিবাহের বয়স হওয়াতে সে একটি গরীব মেয়েকে বিবাহ করলে। যথাসময়ে তার দু'টি পুত্র হ'ল।

ওদিকে গ্রামবাসীরা 'সুশাসন' আর 'দুঃশাসন' কাকে বলে, এই ব্যাখ্যা করবার জন্য মিত্রবিন্দককে শিক্ষক নিযুক্ত করলে। গ্রামবাসীরা তাকে প্রথমে সুনজরে দেখতে থাকে। তার সুযোগ-সুবিধার জন্য খাদ্য-বস্ত্রের, মাহিনার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে।

দিন কাটে।

রাজার কানে একথা যায়।

রাজা মিত্রবিন্দকের নামে অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

মিত্রবিন্দককে কিছু বললেন না। কিন্তু গ্রামবাসীদের উপর নানারকম নির্যাতন করতে লাগলেন। তারা সাতবার শাস্তি পেলে। তাদের গৃহগুলোও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। তাদের পুকুরগুলোও সাতবার আপনা-আপনি শুষ্ক হয়ে উঠলো। সে এক অতি বিশ্রী কাণ্ড!

একটার পর একটা অশুভ ঘটনা ঘটছে দেখে গ্রামবাসীরা একদিন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে ঃ—

ঃ তাই তো! এসব কী ঘটছে? আগে তো আমরা বেশ সুখে-শান্তিতে ছিলেম! কিন্তু এই মিত্রবিন্দক আসার পর থেকেই যতসব অশুভ ঘটনা একটার পর একটা ক'রে ঘটছে। আমাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

না, ওকে আর এখানে রাখা সমীচীন নয়। লোকটা অত্যন্ত অপয়া। এসো, আজ ওকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দি'।

গ্রামবাসীরা করেও তাই। মিত্রবিন্দককে বেশ ক'রে ঘা-কতক দিয়ে গ্রাম থেকে দূর ক'রে দিলে। মিত্রবিন্দক তখন স্ত্রী, পুত্র নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলো। সেই গভীর অরণ্যে থাকতো রাক্ষসেরা। তারা ওর স্ত্রী ও পুত্র দু'টিকে হত্যা ক'রে উদরস্থ করলো। মিত্রবিন্দক তখন পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচালে। এরপর বহুস্থানে ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে সাগরতীরবর্তী 'গম্ভীরা' বন্দরে উপনীত হ'ল। ঐ বন্দর থেকে তখন একটি জাহাজ ছাড়বার উদ্যোগ-আয়োজন করছিল। মিত্রবিন্দক একজন কর্মচারী হয়ে ঐ জাহাজে উঠে বসলো।

জাহাজ ছেড়ে যায় বন্দর।

জাহাজ বেশ চলতে থাকে সমুদ্রের উপর দিয়ে। তর্-তর্ ক'রে চলতে থাকে সমুদ্রের উপর দিয়ে। কোনো বাধা নেই। কোনো বিপত্তি নেই।

সাতদিন এমনি ভালোভাবেই গেলো।

কিন্তু আটদিনের মাথায় হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটে। জাহাজ বেশ চলতে চলতে থেমে যায়। হাজার চেষ্টায়ও জাহাজ আর চলে না। মনে হ'ল—কোনো মগ্নশৈলে সংলগ্ন হয়ে জাহাজটি অবরুদ্ধ হয়েছে।

কেন হঠাৎ এমনি হ'ল! জাহাজের আরোহীরা ভাবতে লাগলো :—নিশ্চয় কোনো মহাপাপী এই জাহাজে আছে! তারই মহাপাতকতার ফলে জাহাজ এমনিভাবে অবরুদ্ধ হয়েছে। কে এমন মহাপাপী? মহা হৈ-চৈ প'ড়ে যায় তখন। সবাই চীৎকার করতে থাকে—খুঁজে বের করো, কে এমন মহাপাপী।

একটি ক্রিয়ার দ্বারা তারা জানতে পারে—মিত্রবিন্দক-ই সেই মহাপাপী।

বাঁশের ভেলা সমুদ্রের উপর ভাসিয়ে দেয় আরোহীরা। তারপর পাঁজাকোলা ক'রে মিত্রবিন্দককে সমুদ্রের গভীর জলে নিক্ষেপ করে। জাহাজ আবার আগের মতোই তর্-তর্ ক'রে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে থাকে।

মিত্রবিন্দক বহুকষ্টে সেই বাঁশের ভেলার উপরে উঠে বসে।

সমুদ্রের স্রোতের টানে সে ভেসে চলে। গতজন্মে সম্যক সম্বুদ্ধ কাশ্যপের (গৌতমবুদ্ধের ঠিক আগের বুদ্ধ) সময়ে শীলব্রত পালন ক'রে মিত্রবিন্দক যেটুকু পুণ্য সঞ্চয় করেছিল, তারই প্রভাবে এখন সে সমুদ্রবক্ষে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বিমানে চারটি দেবকন্যাকে দেখতে পেলে।

বিমানে যে চারটি দেবকন্যাকে দেখা গেলো, তারা আসলে কিন্তু দেবকন্যা নয়। তারা মায়াবিনী। ছলনা ক'রে তারা দেবকন্যার 'বেশ' ধরেছে।

এইরূপ প্রবাদ যে, তখনকার সময়ে বিমানবাসিনী মায়াবিনী প্রেতেরা পালাক্রমে এক সপ্তাহ সুখ এবং এক সপ্তাহ দুঃখ

ভোগ করতো। কাজেই, সপ্তাহের শেষে দুঃখ ভোগ করবার জন্য তাদের অন্যত্র যেতে হ'ল। যাবার সময় তারা মিত্রবিন্দককে ব'লে গেলো :—

: আমরা যতদিন না আবার এখানে ফিরে আসি, ততদিন তুমি এখানে থাকবে। দেখো, যেন আমাদের কথা অগ্রাহ্য ক'রো না।

মিত্রবিন্দকের স্বভাব ছিল—কারুর কথা গ্রাহ্য না করা। এই স্বভাববশতঃ সে ওদের কথা অমান্য ক'রে ভেলায় চ'ড়ে অন্য একটি রজত বিমানের কাছে এলো। এই রজত বিমানে ছিল আটটি দেবকন্যা। মিত্রবিন্দক ওদের দেখতে পেলে।

মিত্রবিন্দকের ভেলা চলতে থাকে।

সমুদ্রের উপর ভাসমান একটি মণিময় বিমান দেখতে পায় মিত্রবিন্দক।

ঐ বিমানে ষোলজন দেবকন্যাকে দেখতে পায় মিত্রবিন্দক।

আরো অগ্রসর হয় মিত্রবিন্দক। এবার দেখতে পায়—একটি কাঞ্চনময় বিমান। এই কাঞ্চনময় বিমানে তখন বসেছিল চব্বিশটি দেবকন্যা।

ওদের দেখতে পেলে মিত্রবিন্দক।

ওরা সবাই মিত্রবিন্দককে থামতে বললে।

কিন্তু মিত্রবিন্দক ওদের কথায় কান দেয় না। নিজের জিদেই ভেলা চালিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকে।

মিত্রবিন্দকের বাঁশের ভেলা সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ভাসতে ভাসতে ভেলা গিয়ে থামে যক্ষদের আবাস —একটি দ্বীপে।

এখানে একটি যক্ষিণী ছাগীর রূপ ধারণ ক'রে বিচরণ করছে। মিত্রবিন্দক ওকে যক্ষিণী ব'লে চিনতে পারে না। ছাগী ভেবেই মাংসলোভে তাকে মারবার জন্য তার পা' নিজের হাত দিয়ে চেপে ধরলে। তখন সেই ছাগীবেশধারিণী যক্ষিণী এক অলৌকিক শক্তিতে মিত্রবিন্দককে এমন প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় যে, আকাশ-পথে সমুদ্র পার হয়ে সে ঘুরতে ঘুরতে বারাণসী-নগরের কণ্টকময় পরিখার উপর পড়লো, তারপর সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে কিছু দূরে এক জায়গায় গিয়ে থামলো।

ঐ পরিখার কাছাকাছি রাজার ছাগল চ'রে বেড়াতো। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে চোর সুবিধা পেলেই দু'-চারটি ছাগল অপহরণ করতো। সেই জন্য ছাগ-পালকেরা চোর ধরতে এদিকে-সেদিকে লুকিয়ে থাকতো।

মিত্রবিন্দক দাঁড়িয়ে উঠে ঐ সমস্ত ছাগল দেখতে পায়।

ভাবে মিত্রবিন্দক ঃ—

ঃ দ্বীপে ছাগীর পা' ধ'রে ছিলেম ব'লে এখানে এসে পড়েছি। যদি এদের একটিকে ধ'রে টানি, তাহ'লে সেই বিমান-বাসিনী দেবকন্যাদের কাছে গিয়ে হাজির হবো।

এই কথা ভাবতে ভাবতে মিত্রবিন্দক দৌড়ে যায় একটি ছাগলের কাছে। তার একটি পা' হাত দিয়ে টেনে ধরে

প্রাণপণ শক্তিতে। ছাগলটি তখন ব্যা ব্যা ক'রে ডেকে উঠলো। অমনি চারিদিক থেকে ছাগ-পালকেরা ছুটে এলো। ধ'রে ফেললে মিত্রবিন্দককে। দড়ি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে রাজার কাছে নিয়ে যেতে লাগলো। যেতে যেতে তারা বিকৃত-স্বরে মিত্রবিন্দককে বলতে লাগলো :—

: এতদিন চুরি ক'রে রাজার ছাগল খেয়েছিস্। আজ আর তোর নিস্তার নেই।

সেই সময়ে…

বোধিসত্ত্ব তাঁর পাঁচ-শো' ব্রাহ্মণ-শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে স্নান করবার জন্য বেরিয়েছেন।

সুমুখেই এই দৃশ্য। বোধিসত্ত্ব মিত্রবিন্দককে দেখেই চিনতে পারেন। ছাগ-পালকদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন :—

: তোমরা এই লোকটিকে ধরেছো কেন? এ যে আমার-ই আর একটি শিষ্য!

বোধিসত্ত্বকে দেখে ওরা সকলে বিনয়সহকারে বলে :—

: এ লোকটা পাকা চোর। ছাগলের পা' ধ'রে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় ধরা পড়েছে।

বোধিসত্ত্ব একটু চিন্তা করলেন। বললেন :—

: তা' সে যাই হ'ক। ওকে আমার হাতে দাও। ও আমার দাস হয়ে থাকবে। এখন আমার কাছে থাকলে ওর সব দোষ শুধরে যাবে।

: বেশ তো! সে তো খুব ভালো কথা!

এই ব'লে ছাগ-পালকেরা মিত্রবিন্দককে বোধিসত্ত্বের হাতে সমর্পণ ক'রে নিজেদের কাজে অন্যত্র চ'লে যায়।

বোধিসত্ত্ব মিত্রবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন :—

: মিত্রবিন্দক, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?

মিত্রবিন্দক এখন মরমে মরে যায়! লজ্জায় নতমস্তকে সমস্ত ঘটনা বোধিসত্ত্বের কাছে নিবেদন করে। শুনে বোধিসত্ত্ব ধীরে ধীরে বললেন :—

: তুমি কারুর ভালো উপদেশ শুনতে না ব'লেই তোমার এই শোচনীয় পরিণতি হয়েছে। এছাড়া তোমার বহু গত-জীবনে তুমি মহাপাপ করেছিলে। তার ফলেই তোমার এই শোচনীয় দুর্দশা।

মিত্রবিন্দক ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলে। বললে :—

: প্রভু, আমি কি পাপ করেছিলেম—বলবেন কি ?

বোধিসত্ত্ব বললেন :—

: বলছি, শোনো। তোমার সেই পাপের কথা শুনলে তোমার মনে অনুশোচনা আসতে পারে। তাতেই এজন্মে তোমার কিছুটা পুণ্য সঞ্চয় হবে এবং তুমি পরজন্মে সৎ-পথে থেকে মানবকল্যাণে জীবন-উৎসর্গ করলেই বুদ্ধত্ব লাভ হবে।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব ক্ষণকাল মৌন থাকার পর পুনশ্চ ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন :—

: এক গ্রামে তুমি থাকতে। ঐ গ্রামের ভূস্বামী তোমার ভরণ-পোষণের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে অন্যত্র

একজন 'অর্হন' ছিলেন। তিনি সঙ্ঘের সমস্ত ভিক্ষুর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। তাঁর কোনো অহঙ্কার ছিল না।

একদিন ঐ ভূস্বামীর গৃহে এসে হাজির হলেন সেই অর্হন। তাঁর চেহারা এবং চাল-চলন দেখে ভূস্বামী মুগ্ধ হলেন। অর্হনকে বড়ো ভালো লাগলো তাঁর। অর্হনের হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র নিজের হাতে নিয়ে তাঁকে গৃহের মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং আহার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। এরপর সেই অর্হনের কাছে থেকে কিছুক্ষণ ধর্মকথা শুনলেন। ভূস্বামী বললেন :—প্রভু, কাছেই আমাদের যে বিহার (আশ্রম) আছে, দয়া ক'রে সেখানে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। ...অর্হন ভূস্বামীর অনুরোধমত কাজ করলেন। তিনি যান নিকটস্থ বিহারে। এখানে তুমি থাকতে। অর্হন তোমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। ওদিকে দিনের আলোর শেষে সন্ধ্যা নেমে এসেছে পৃথিবীতে। ভূস্বামী এলেন সেই বিহারে। সঙ্গে তাঁর গুটিকয়েক ভৃত্য। এদের কারুর হাতে ফুলের মালা। কারুর হাতে সুগন্ধি। কারুর হাতে তৈল ও প্রদীপ। ভূস্বামী তোমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। তিনি তোমাকে প্রণাম ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন :—আজ এখানে এক অর্হনের অতিথি হবার কথা ছিল, তিনি এখানে এসেছেন কি? শুনে তুমি জবাব দিলে :—হ্যাঁ, এসেছেন। এই ব'লে ভূস্বামীকে ঘরটি দেখিয়ে দিলে। ভূস্বামী সেই ঘরে গিয়ে অর্হনকে দেখতে পেলেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে একপাশে বসলেন। ধর্মকথা শুনলেন।

ফিরে যাবার সময় অর্হন ও তোমাকে পরদিন ভূস্বামীর গৃহে আহার করবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন। ভূস্বামী চ'লে যাবার পর তুমি ভাবতে লাগলে :—বেশ দেখতে পাচ্ছি, ভূস্বামী আমার হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছেন। যদি এই অর্হন এখানে থাকেন, তাহ'লে আমার আর প্রতিপত্তি থাকবে না।...এই কথা ভাবতে ভাবতে তুমি সেই ধর্মনিষ্ঠ অর্হনের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলে এবং যাতে অর্হন চিরদিন এই বিহারে থাকতে না পারেন, তার উপায় চিন্তা করতে লাগলে। ওদিকে রাত্রি অনেক হয়ে এলো। অর্হন শয়ন করতে যাবার আগে তোমাকে অভিবাদন করলেন। কিন্তু তুমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘৃণিত পন্থা চিন্তা করছিলে ব'লে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঁর সঙ্গে কোনো কথাই বললে না। অর্হন তোমার মনের ভাব বুঝতে পারেন। তিনি ভাবেন :—এই স্থবির বুঝতে পারছেন না যে, ভূস্বামীর উপর বা ভিক্ষুসঙ্ঘে ওঁর যে প্রতিপত্তি আছে, আমি কখনোই তার অন্তরায় হবো না।

পরদিন সকালে।

বিহারবাসী ভিক্ষুদের ঘুম ভাঙাবার জন্য বিহারের নিয়ম—কাঁসর বাজানো ও দরজায়-দরজায় আঘাত করা। এই ভারটি ছিল তোমার উপর। সকালবেলা তুমি খুব আস্তে আস্তে কাঁসর বাজালে। আঙুলের টোকা দিয়ে দরজায়-দরজায় মৃদু আঘাত করলে। তোমার ইচ্ছা নয় যে, অর্হনের ঘুম ভেঙে

যায়। অথচ আশ্রমের নিয়মটি তোমাকে পালন করতেই হবে। এই জন্য তুমি যথাসম্ভব আস্তে কাঁসর বাজিয়ে ও দরজায়-দরজায় আঘাত ক'রে দু'দিকই রক্ষা করলে। এরপর তুমি ভূস্বামীর গৃহে এলে। ভূস্বামী তোমার হাত থেকে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করলেন। তোমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ—অর্হন কোথায়? তাঁকে তো দেখছি নে? তুমি তখন ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে বললেঃ—আপনার বন্ধুর কোনো সংবাদ আমি রাখি নে। আমি কাঁসর বাজালেম। দরজায় আঘাত করলেম। কিন্তু কিছুতেই ওঁকে জাগাতে পারলেম না। বোধকরি, কাল উনি এখানে চর্ব্যচূষ্য আহার ক'রে এখনো খাদ্য পরিপাক করতে পারেন নি। কাজে কাজেই, তিনি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছেন। এইরকম লোকের মনস্তুষ্টিতে কি প্রয়োজন, বুঝতে পারি নে।—ওদিকে অর্হন ভিক্ষা পাবার সময় পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা ক'রে নিরাশ হয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলেন।

ভূস্বামী তোমাকে পরমান্ন খাওয়ালেন। তারপর সুগন্ধিচূর্ণ দিয়ে তোমার পাত্রটি পরিষ্কার ক'রে আবার সেটি পায়সে পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন। বললেনঃ—মশাই, বোধকরি অর্হন পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন! তাঁর জন্য এই পায়সটুকু নিয়ে যান। তুমি কোনো আপত্তি করলে না। পায়সপূর্ণ পাত্রটি হাতে নিয়ে পথে নেমে এলে। পথে চলতে চলতে ভাবতে লাগলেঃ—এই অর্হন যদি একবার এই পরমান্নের আস্বাদ পান, তাহ'লে কোনোমতেই আর আশ্রম ত্যাগ করবেন

না। কিন্তু কি উপায়েই-বা তাঁর মনে এই আশ্রমের প্রতি বীতশ্রদ্ধার ভাবটি জাগিয়ে তোলা যায়? এই পায়স যদি অন্য কাউকে খেতে দি', তাহ'লে এসব কথা ফাঁস্ হয়ে যাবে। জলে যদি পয়স ঢেলে দি'—জলের উপর ঘি উঠবে ভেসে। মাটিতে ঢেলে দিলে কাকের দল এসে জুটবে। মনে মনে এইসব চিন্তা করতে করতে তুমি হঠাৎ একটা 'দগ্ধক্ষেত্র' দেখতে পেলে। সেখানে পায়স ঢেলে দিলে। তারপর তুমি আশ্রমে ফিরে এলে। সেইখানে তুমি সেই অর্হনকে দেখতে পেলে না। তোমার মনে ভাবান্তর ঘটলো। তুমি তখন মনে করলে—ঐ মহাত্মা তোমার মনের কথা জানতে পেরে এই আশ্রম ত্যাগ ক'রে গেছেন। তুমি তখন আক্ষেপ করতে লাগলে এই ব'লে ঃ—হায় হায়! নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি এ কি করলেম! তোমার এমন অনুতাপ হ'ল যে, ঐ কথা অহরহঃ চিন্তা করতে করতে তোমার দেহ শুকিয়ে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে উঠলো। তোমার মৃত্যু হ'ল।...মৃত্যুর পর তোমায় বহু বছর যক্ষ-জন্ম নিতে হয়। যক্ষ-জন্মের পর পাঁচ-শো'বার কুকুর-জন্ম নিতে হ'ল তোমায়। কুকুর-জন্মের পর তুমি এজন্মে মানুষ হয়ে জন্মালে। এবার তুমি কাশীরাজ্যে এক ভিক্ষুকের গৃহে জন্মগ্রহণ করলে। নাম হ'ল তোমার মিত্রবিন্দক। কিন্তু তোমার অদৃষ্টের ফলে, ঐ ভিক্ষুক-পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত রইলো না। তোমার মা-বাবা তোমার উপর বিরক্ত হয়ে একদিন তোমাকে বাড়ী থেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তুমি এদেশ-

সেদেশ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লে আমার কাছে। আমি তোমার ভরণ-পোষণের এবং শিক্ষার ভার নিলেম। তোমার এক পূর্বজন্মে তুমি ছিলে—লোশক তিষ্য। এই নাম ছিল তোমার। অতীত-জীবনে তুমি অন্যের প্রাপ্তিতে বাধা দিয়েছিলে। সেই পাপে তুমি এজন্মে এত কম পেয়েছো। কিন্তু অতীত-জীবনে তোমার কিছু সুকৃতি ছিল, তাই এখন তোমার অনুশোচনা হচ্ছে। এর জন্য তোমার পাপের ভার লাঘব হবে।

সমস্ত শুনে মিত্রবিন্দক বোধিসত্ত্বের পা' জড়িয়ে ধ'রে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো। বললে ঃ—

ঃ প্রভু, আমাকে আপনার পায়ে ঠাঁই দিন।

বোধিসত্ত্ব দেবজ্যোতিতে চারিদিক উদ্ভাসিত ক'রে স্নেহ-জড়িতকণ্ঠে বললেন ঃ—

ঃ বৎস, বিচলিত হ'য়ো না। তোমার মুক্তির আর বেশী দেরী নেই।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব মিত্রবিন্দকের মাথায় দক্ষিণহস্ত রাখলেন।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন তাঁর শিষ্য লোশক তিষ্যের সম্বন্ধে ঐ অতীত-কথা বলেন। তখন ভগরান গৌতমবুদ্ধ ছিলেন—লোক-বিখ্যাত অধ্যাপক। তখন লোশক তিষ্য ছিল—মিত্রবিন্দক।



পুরাকালের কথা। মগধের রাজগৃহ-নগরে তখন এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যখন তিনি বড়ো হলেন, তখন প্রায় এক হাজার মৃগের সঙ্গে বনে বিচরণ করতে লাগলেন। সময়ে তাঁর দু'টি পুত্র হ'ল। বড়োটির নাম লক্ষণ। ছোটোটির নাম—কালু। বোধিসত্ত্ব যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন হাজার মৃগের ভার আর নিজের উপর রাখলেন না। ঐ হাজার মৃগের ভার দু'টি পুত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ ক'রে দিলেন! বড়ো পুত্র লক্ষণের উপর পাঁচ-শো' মৃগের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ছোটো পুত্র কালুর উপর বাকী পাঁচ-শো' মৃগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করলেন।

তখন মগধরাজ্যে ফসলের সময় বড়ো বিপদ দেখা দিতো। মৃগেরা মগধরাজ্যের ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলতো। এই

কারণে লোকে মৃগদের মারবার জন্য কোথাও গর্ত খুঁড়ে রাখতো, কোথাও-বা শূল পুঁতে রাখতো। কোনো স্থানে আবার 'পাসান যন্ত' (পাথরের যন্ত্র—মৃগ ধরবার একপ্রকার ফাঁদ) পেতে রাখতো। কোথাও-বা জাল পেতে রাখতো।

দিন যায়। একদিন বোধিসত্ত্ব দেখলেন, ফসলের সময় এসেছে। তিনি পুত্রদের কাছে ডেকে বললেন :—

: দেখো, এখন মাঠে ফসল হবে। এমনি সময়ে প্রতিবছর বহু মৃগ মারা পড়ে। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমাদের বহুদর্শিতা আছে। এই গুণের জন্য আমরা যে-কোনো উপায়ে আত্মরক্ষা করতে পারবো। তোমরা এখনো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারো নি। বিপদে নিজেদের রক্ষা করবার মতো কলা-কৌশল তোমরা জানো না। তোমরা যে-যার অনুচর নিয়ে পাহাড়ে যাও। যখন মাঠের সব ফসল উঠে যাবে, তখন ফিরে এসো।

লক্ষণ ও কালু পিতার আদেশমত কাজ করে।

কিন্তু লক্ষণ আর কালুর মধ্যে সুবুদ্ধির তারতম্য ছিল অনেক। কালুর বুদ্ধিশুদ্ধি ভালো ছিল না। কোন্ সময় চলতে হয়, কোন্ সময়ে বিশ্রাম করতে হয়, সে-জ্ঞান কালুর ছিল না। সে অনুচরমৃগদের নিয়ে সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়—যখন খুশী তখন লোকালয়ের কাছ দিয়ে চলা-ফেরা করতে লাগলো। এতে লোকদের মৃগদের বধ করা বেশ সহজ হয়ে উঠলো। কখনো লুকিয়ে থেকে, আবার কখনো-বা সামনা-

সামনি বহু মৃগ তারা মারতে লাগলো। কালুর এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তার অনুচরমৃগদের অধিকাংশই জীবন হারায়। কালু যখন পাহাড়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন দেখলে—তার অনুচরমৃগদের মধ্যে গুটিকয়েক মাত্র জীবিত আছে।

ওদিকে লক্ষণ কিন্তু বেশ চালাক-চতুর। ও লোকালয়ের ধার দিয়েও যেতো না। দিনের বেলায় বা সন্ধ্যাবেলায় চলা-ফেরা করতো না। ও চলা-ফেরা করতো রাত্রিবেলায়। কাজে কাজেই, তার অনুচরমৃগেরা সবাই জীবিত-অবস্থায় পাহাড়ে গিয়ে উঠলো।

লক্ষণ ও কালু—দু'ভাই প্রায় চারমাস পাহাড়ে কাটিয়ে দিলে।

যথাসময়েই ওরা পাহাড় থেকে নেমে এলো।

কিন্তু কালু এবারেও আগের মতো পথ চলতে থাকে। ওর এই নির্বুদ্ধিতার জন্য লোকে সুবিধা পেয়ে ওর অনুচরমৃগদের মেরে ফেললে। কালু পরম বিষণ্ণচিত্তে একা ফিরে আসে পিতার কাছে।

লক্ষণও ফিরে আসে পিতার কাছে।

সঙ্গে তার পাঁচ-শো'টি অনুচরমৃগ। একটিও মারা পড়ে নি। হাসি-হাসি মুখ লক্ষণের। পিতা তাকে দেখে খুব খুশী! লক্ষণকে আশীর্বাদ করেন। বলেন ঃ—

: যে সদাচারী, সুশীল, সদয় এবং বুদ্ধিমান, সে এ-জগতের পরম কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু যে অসভ্য, দুঃশীল, নির্দয় এবং মূর্খ, তার দ্বারা এ-জগতের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।

দেবদত্ত প্রথমে গৌতমবুদ্ধের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে দেবদত্ত বুদ্ধের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। দেবদত্ত যে বুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, এইটাই প্রমাণ করবার জন্য তিনি পাঁচটি নিয়ম বুদ্ধের কাছে প্রস্তাব করেন। সেই পাঁচটি নিয়ম হ'ল :—ভিক্ষুরা চিরজীবন বনে থাকবেন। তাঁরা কোনো বাসা বাঁধবেন না, গাছের তলায় বাস করবেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনধারণ করবেন। লোকালয়ের আবর্জনা-স্তূপে যে সমস্ত ছিন্নবস্ত্র পাওয়া যাবে, কেবল সেইগুলোই পরিধান করবেন। কখনো মাছ-মাংস খাবেন না। বুদ্ধ ঐসকল নিয়ম গ্রহণ না করাতে দেবদত্ত সঙ্ঘ ত্যাগ ক'রে পাঁচ-শো' ভিক্ষু নিয়ে 'গয়শির' পর্বতে গেলেন। সেখানে বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে একটা নূতন সম্প্রদায় গঠন করলেন।

কিছুদিন পর বুদ্ধ জানতে পারলেন—ঐ পাঁচ-শো' শিষ্যের জ্ঞান-বুদ্ধি এমন ভাবে উন্নত হয়েছে যে, সদুপদেশ লাভ করলেই তাঁরা বুদ্ধের শরণ নেবে। বুদ্ধ তখন সারীপুত্রকে ডেকে বললেন :—

: তোমার যে পাঁচ-শো' শিষ্য দেবদত্তের সঙ্গে ভিন্নপথে গিয়েছিল, এখন তাদের সুমতি হয়েছে। তুমি কয়েকজন ভিক্ষু

সঙ্গে নিয়ে 'গয়শির' পর্বতে যাও। ওদের সতুপদেশ দিয়ে ফিরিয়ে আনো।

সারীপুত্র বিনয়ের সঙ্গে বললেন :—

: আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি এখনি 'গয়শির' পর্বত-অভিমুখে যাত্রা করছি।

পরদিন সকালবেলায় দেখা গেলো—সারীপুত্র সেই পাঁচ-শো' শিষ্যকে বেণুবনে ফিরিয়ে এনেছেন। বেণবনে যে-সব ভিক্ষুরা ছিলেন, তাঁরা এই দেখে পরমোল্লাসে ব'লে উঠলেন :—

: আমাদের ধর্মসেনাপতি সারীপুত্রের কী অসীম ক্ষমতা! উনি দেবদত্তের সমস্ত শিষ্যদের এখানে নিয়ে এসেছেন।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ সেখানে ছিলেন। শুনে তিনি ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে বললেন :—

: সারীপুত্র অতীত-জন্মেও এই রকম অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল।...এই ব'লে ভগবান গৌতমবুদ্ধ অতীত-জন্মের ঐ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন।

তখন গৌতমবুদ্ধ ছিলেন—লক্ষণ ও কালুর পিতা।

তখন সারীপুত্র ছিলেন—লক্ষণ।

তখন দেবদত্ত ছিলেন—কালু।



প্রাচীনকালের কথা।

তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন—ব্রহ্মদত্ত।

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বের সময় বারাণসীতে থাকতেন এক লোক-বিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি ব্রাহ্মণ। নানাশাস্ত্রে তাঁর বিলক্ষণ দখল।

একদিন···

সেই অধ্যাপক একটি ছাগল নিয়ে এলেন কি জানি কোথা থেকে। শিষ্যদের ছাগলটি দেখিয়ে বললেন ঃ—

ঃবৎসগণ, এই ছাগলটিকে নিয়ে যাও নদীতে। স্নান করাও। তারপর 'পঞ্চাঙ্গুলিক' (যে-পশুকে বলি দেওয়া হ'ত, লোকে সিন্দুর, চন্দন, প্রভৃতি রঞ্জনদ্রব্য হাতে মাখিয়ে তার অঙ্গ শোভিত করবার জন্য পাঁচ-আঙুলের ছাপ দিতো। এখনো দেখা যায়—বলি দেবার আগে ছাগের কপালে সিন্দুরের

একটি বড়ো ক'রে দাগ দেওয়া হয়।) দিয়ে সাজিয়ে নদীর তীরে রেখে এসো। আজ আমার মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবার দিন। ঐ ছাগলটি আমি তাঁদের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধনে বলি দেবো।

অধ্যাপকের শিষ্যেরা তাই করে।

ছাগলটিকে নদীর তীরে দেখা যায়। এদিক-ওদিক বিচরণ করতে করতে হঠাৎ তার অতীত-জন্মের কথা মনে পড়ে যায়। জাতিস্মর ছাগলটি তখন আনন্দের সঙ্গে অট্টহাস্য ক'রে উঠলো ঃ—আজ-ই আমার সকল দুঃখের অবসান হবে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেলো, ছাগলটি আর্তনাদ করছে ঃ—হায়রে! আমি এতদিন যে-দুঃখ ভোগ ক'রে এলেম, আমাকে বলি দিয়ে ঐ ব্রাহ্মণও সেই-দুঃখ ভোগ করবেন।

শিষ্যেরা এই হাসি-কান্নার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। ছাগলটিকে জিজ্ঞাসা করে ঃ—

ঃ তুমি হাসবার সময় বিকট শব্দ করলে, আবার কাঁদবার সময়ও বিকট শব্দ করলে। কেন বলতো? এর মানে কি?

ঃ তোমাদের অধ্যাপকের কাছে আমাকে নিয়ে চলো। সেখানে ওঁর সামনেই ঐ প্রশ্ন আমায় ক'রো। তখন এর জবাব পাবে।

যথাসময়েই শিষ্যেরা নিয়ে আসে ছাগলটিকে অধ্যাপকের কাছে। সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে বলে। শুনে অধ্যাপক নিজেই ছাগলটির কাছ থেকে হাসবার ও কাঁদবার কারণ জানতে চান।

ছাগলটি বলে :—

: দ্বিজবর, একটা সময় ছিল, যখন আমিও আপনার মতো পণ্ডিত ছিলেম। কিন্তু একদিন একটি ছাগ বলি দিয়ে 'মৃতক-ভক্ত' (মৃত পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মার তৃপ্তিসাধনে যে-ভোজ্য নিবেদন করা হয়) দিয়েছিলেম। সেই পাপে আমি চার-শো' নিরানব্বইবার ছাগজন্ম গ্রহণ ক'রে শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এই আমার শেষ জন্ম। এখনি চিরকালের জন্য দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো—এই ভেবে আমি হেসে ছিলেম। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেম—আমি তো পাঁচ-শো' বার শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মুক্ত হ'তে চলেছি, কিন্তু আপনাকেও ঠিক সেই রকম পাঁচ-শো' বার শিরশ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সেই দুঃখে আমি কেঁদেছিলেম।

ছাগলটির কথা শুনে অধ্যাপক নীরবে বহুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর ছাগলটিকে বললেন :—

: ভয় নেই। আমি তোমার প্রাণনাশ করবো না।

: আপনি আমাকে হত্যা করুন আর নাই করুন, আজ আর আমার রক্ষা নেই।

অধ্যাপক অভয় দেন। বলেন :—

ঃ কোনো ভয় নেই তোমার। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমাকে রক্ষা করবো। দেখি, কে তোমাকে হত্যা করে!

ঃ দ্বিজবর, আপনার রক্ষা করবার শক্তির অপেক্ষা আমার কৃতপাপের শক্তি অনেক বেশী। আপনি হাজার চেষ্টা করুন না কেন, আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না কিছুতেই।

অধ্যাপক আর কোনো কথা বললেন না। ছাগলটিকে বন্ধনমুক্ত ক'রে দিলেন। কারণ, শিষ্যেরা ছাগলটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছিল।

অধ্যাপক থাকেন ছাগলটির সঙ্গে সঙ্গে।

শিষ্যেরাও থাকে ছাগলটির সঙ্গে সঙ্গে।

অধ্যাপক নিজের মনেই বলেন ঃ—কার সাধ্য এই ছাগকে হত্যা করে? আমি নিজে এর সঙ্গে সঙ্গে আছি। যে প্রকারেই হ'ক, একে রক্ষা করবোই।

ছাগলটি বন্ধনমুক্ত হয়ে একখণ্ড পাথরের উপর উঠে গ্রীবা প্রসারিত ক'রে গাছের পাতা খেতে থাকে।

বিধির লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। আকাশে মেঘ নেই। পরিষ্কার আকাশ। সহসা বজ্রপাত হ'ল সেই পাথরের উপরে। সেই বজ্রাঘাতে পাথর টুক্‌রা-টুক্‌রা হয়ে গেলো। আর সেই পাথরের একখণ্ড সবেগে এসে ছাগলটির প্রসারিত গ্রীবায় আঘাত করলো। সেই প্রচণ্ড আঘাতে ছাগলটির মাথা চক্ষের নিমেষে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

ব্যাপার দেখে অধ্যাপক এবং তাঁর শিষ্যেরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে বিস্তর লোক জমে গেলো।

তখন বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতারূপে সেখানে বাস করছিলেন। দৈবশক্তিতে তিনি শূন্যে বীরাসনে বসলেন। সবাইয়ের দৃষ্টি গেলো তাঁর দিকে। তারা ধন্য হ'ল।

বোধিসত্ত্ব ভাবেন:—হায় রে! এই হতভাগ্যেরা যদি কুকর্মের বিষময় ফল জানতে পারে, তাহ'লে এরা কখনো প্রাণি-হত্যা করে না!

বোধিসত্ত্ব কৃপাপরবশ হয়ে তাদের সদুপদেশ দিলেন। শুনে সকলে প্রতিজ্ঞা করলে—জীবনে কখনো তারা প্রাণি-হত্যা করবে না।

শাস্তা (ভগবান গৌতমবুদ্ধ) যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:—

: ভগবন্, লোকে যে প্রাণিহত্যা ক'রে 'মৃতকভক্ত' দেয়, এতে কি কোনো সুফল পাওয়া যায়?

বুদ্ধ বলেন:—

: না। কোনো সুফল পাওয়া যায় না। 'মৃতকভক্তে' কোনো সুফল নেই। প্রাণিহত্যায় কোনো পুণ্য নেই। পূর্বে পণ্ডিতেরা এই কুপ্রথার দোষ বর্ণনা ক'রে সমগ্র জম্বুদ্বীপ

থেকে প্রাণিহত্যা লোপ ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে ক'রে লোকে অতীত-স্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য এই প্রাণিহত্যা ঘটতে আবার দেখা যাচ্ছে। প্রাণিহত্যা মহাপাপ।

এই ব'লে ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রাণিহত্যা করতে নিষেধ ক'রে তাঁর অতীত-জন্মের ঐ ঘটনাটি বললেন।



বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের শাসনকালে বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। বোধিসত্ত্বের নামকরণের দিন রাজা ও রাণী বহু দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের পুত্রের 'অদৃষ্ট'।

দৈবজ্ঞেরা বোধিসত্ত্বের মুখ-চোখে সুলক্ষণ অবলোকন ক'রে বললেন :—

: মহারাজ, এই পুত্র আপনার মৃত্যুর পর রাজা হয়ে সর্বগুণের আধার হবেন। পঞ্চবিধ আয়ুধের (খড়্গ, শক্তি, ধনুক, কুঠার ও চর্ম) প্রভাবে এঁর যশ-খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সমস্ত জম্বুদ্বীপে আপনার এই পুত্রের সমকক্ষ আর কেউ থাকবে না।

দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ-বাণী শুনে রাজা ও রাণীর মুখমণ্ডল খুশীতে ঝল্-মল্ করে উঠলো। তাঁরা পুত্রের নাম রাখলেন—পঞ্চায়ুধকুমার।

দিন যায়। মাস কাটে। বছরের পর বছর কেটে যায়।

বোধিসত্ত্ব ষোল বছরে পদার্পণ করলেন। এখন তিনি ভালো-মন্দ বিবেচনা করবার মতো জ্ঞান লাভ করেছেন।

ব্রহ্মদত্ত একদিন তাঁকে কাছে ডাকেন। বলেন :—

: বৎস, এখন বিদ্যা শিক্ষা করো।

: কার কাছে বিদ্যা শিক্ষা করবো, বাবা ?

: তক্ষশিলা-নগরে গান্ধার-রাজ্য আছে। সেখানে একজন দেশ-বিখ্যাত আচার্য থাকেন। তুমি তাঁর কাছে যাও। তাঁর কাছেই বিদ্যা শিক্ষা ক'রো। এই নাও এক হাজার মুদ্রা। এই অর্থ তাঁকে গুরুদক্ষিণা দিও।

পিতাকে প্রণাম ক'রে, সেই এক হাজার মুদ্রা নিয়ে বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা-নগরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

যথাসময়ে সেখানে উপনীত হলেন।

সেই দেশ-বিখ্যাত আচার্যের সঙ্গে গান্ধার-রাজ্যে দেখা করলেন। তাঁকে এক হাজার মুদ্রা দিলেন দক্ষিণা। তাঁকে গুরুরূপে বরণ ক'রে তাঁর-ই পাদমূলে ব'সে বিদ্যাভ্যাস করতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব।

এমনি ক'রে কয়েক বছর কেটে যায়।

বোধিসত্ত্ব এবার বারাণসীতে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করেন। গুরুকে জানান্ এই সঙ্কল্প। গুরু তাঁকে অনুমতি দেন। যাবার বেলায় গুরু বোধিসত্ত্বকে দিলেন—পঞ্চবিধ আয়ুধ।

বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করলেন বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব পথের পর পথ অতিক্রম ক'রে চলেছেন।

পথে একটি গভীর অরণ্য। অরণ্যে থাকে এক যক্ষ। নাম—শ্লেষলোম।

বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যের কাছে এসে পড়লেন, তখন যাঁরা তাঁকে দেখতে পেলেন, তাঁরা বললেন :—

: ঠাকুর ঐ অরণ্যে প্রবেশ ক'রো না। ওখানে শ্লেষলোম নামে এক যক্ষ থাকে। সে যাকে দেখে, তাকেই হত্যা করে। বাদ্-বিচার নেই তার কাছে। সে ভয়ানক যক্ষ। দেহ—তালগাছের মতো লম্বা। মাথা—চিলেকোঠার মতো অনেকটা। সামনের দু'টি দাঁত মূলোর মতো দেখতে। পেট নানাবর্ণে বিচিত্র। হাত-পা নীলবর্ণ।

বোধিসত্ত্ব তাঁদের কথায় কান দিলেন না।

বোধিসত্ত্বের আত্মবল ছিল অসাধারণ। সেই বলের উপর নির্ভর ক'রে তিনি নির্ভীকচিত্তে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হন্-হন্ ক'রে সম্মুখভাগে অগ্রসর হন বোধিসত্ত্ব। ক্রমে তিনি অরণ্যের মধ্যভাগে এসে পড়লেন।

সেই শ্লেষলোম যক্ষ বিভীষণ মূর্তিতে সহসা কোথা থেকে এসে বোধিসত্ত্বের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। অসম্ভব কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করে বোধিসত্ত্বকে :—

: যাচ্ছ' কোথায় বাপু হন্-হন্ ক'রে ?—একটু থেমে আগের চেয়েও কর্কশস্বরে বলে :—

ঃ দাঁড়াও। আজ তোমাকে পেয়েছি। জ্যান্ত পেটে পুরবো। আমাকে জানে সবাই। আমার নাম শুনেছো? আমার নাম—শ্লেষলোম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো জীব নেই, যে আমার কবল থেকে নিস্তার পায়। আমি শ্লেষলোম যক্ষ। আমার নামে ত্রিভুবন কাঁপে।

বোধিসত্ত্ব কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ—

ঃ দেখো শ্লেষলোম যক্ষ, আমি নিজের শক্তি বুঝেই এই অরণ্যে প্রবেশ করেছি। আমার শক্তি কতখানি, সে তোমার চেয়ে আমি জানি। তুমি আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছ। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কাজ করো নি। ভালো চাও তো পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াও। নইলে, বিষাক্ত শর নিক্ষেপ ক'রে তোমাকে নিহত করবো।

শ্লেষলোম পথ ছাড়ে না। তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

বোধিসত্ত্ব তখন বাধ্য হয়েই বিষাক্ত শর ধনুকে যোজনা ক'রে, যক্ষের বক্ষস্থল লক্ষ্য ক'রে নিক্ষেপ করলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেই বিষাক্ত শর যক্ষের বক্ষস্থল ভেদ করতে পারে না। ঝুলতে থাকে যক্ষের বক্ষস্থলের লোমরাশিতে আবদ্ধ হয়ে। বোধিসত্ত্ব একে একে পঞ্চাশটি শর নিক্ষেপ করেন। সবগুলির একই অবস্থা—যক্ষের বক্ষস্থলের লোমরাশিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। শরীর বিদ্ধ করতে পারে না।

যক্ষকে এবার ভীষণভাবে গা'ঝাড়া দিয়ে সমস্ত শরগুলিকে মাটিতে ফেলে দিতে দেখা গেলো।

বোধিসত্ত্বকে গ্রাস করবার জন্য অগ্রসর হয় যক্ষ।

বোধিসত্ত্ব তখন সিংহের মতো হুঙ্কার দিয়ে খড়্গ নিষ্কোষিত ক'রে আঘাত করেন যক্ষকে।

খড়্গও যক্ষের লোমরাশিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। দেহ স্পর্শ করতে পারে না।

বোধিসত্ত্ব বিন্দুমাত্রও ভগ্নোৎসাহ হন না। অদম্য উৎসাহে এবং সিংহবিক্রমে তাঁর সমস্ত অস্ত্রই যক্ষের উপর প্রয়োগ করলেন।

বিস্ময়ের কথা—সমস্ত অস্ত্রই নিষ্ফল হ'ল।

বোধিসত্ত্ব তখন মহা হুঙ্কার দিয়ে বললেন ঃ—

ঃ শোনো যক্ষ। আমার নাম পঞ্চায়ুধকুমার। আমি যে কেবল অস্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে তোমার এই অরণ্যে প্রবেশ করেছি, তা' নয়। আমার দেহেও বিলক্ষণ শক্তি আছে। আমি এখুনি এক ঘুষিতে তোমার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ করবো।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব ডানহাত দিয়ে যক্ষকে মারতে লাগলেন।

বোধিসত্ত্বের ডানহাতখানি যক্ষের দেহলোমে আবদ্ধ হয়ে গেলো।

বোধিসত্ত্ব বাঁহাত দিয়ে প্রহার করলেন।

বোধিসত্ত্বের বাঁহাতখানিও যক্ষের দেহলোমে আবদ্ধ হয়ে গেলো।

ডানপা' দিয়ে আঘাত করলেন বোধিসত্ত্ব যক্ষকে। সেটিরও ঐ অবস্থা হ'ল। বাঁপা' দিয়ে আঘাত করলেন। বাঁপা'য়েরও ঐ অবস্থা।

বোধিসত্ত্ব তখনো যক্ষকে পরাজিত করবার আশা পরিত্যাগ করেন নি। নিজের মাথা দিয়ে তাকে এখন সজোরে আঘাত করলেন। হায় রে! এবারও বোধিসত্ত্বের মাথা যক্ষের লোমজালে আবদ্ধ হয়ে রইলো।

এইভাবে 'পঞ্চাঙ্গে' আবদ্ধ হয়ে বোধিসত্ত্ব যক্ষের বিশাল দেহের উপর ঝুলতে লাগলেন। কিন্তু এই বিপর্যয়েও তাঁর মনোবল বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হ'ল না।

ওদিকে যক্ষের মনে ভাবান্তর ঘটে। ভাবে ঃ—এই লোকটি দেখছি অসাধারণ শক্তি রাখে দেহে। এর আর জোড়া নেই। আশ্চর্য! আমার মতো শক্তিশালী যক্ষের হাতে পড়েও এর মনে আশঙ্কার এতটুকু ছায়াপাত হয় নি! আমি এতদিন এই অরণ্যে মানুষ ধ'রে খাচ্ছি, কিন্তু এর মতো নির্ভীক লোক কখনো আমার চোখে পড়ে নি। আমাকে এ ভয় করছে না কেন? নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর একটা কারণ আছে। যক্ষ তখন বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করে ঃ—

ঃ ঠাকুর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্য ক'রে বলবে। আচ্ছা, তোমার মরণভয় নেই কেন?

ঃ ভয়! ভয় করবো কেন? জন্মগ্রহণ করলেই যখন মৃত্যু অবধারিত, তখন আমি জীবনের ভয় করি নে। এছাড়া আমার

উদরে 'বজ্রায়ুধ' (জ্ঞানরূপ তলোয়ার) আছে। তুমি আমাকে খেতে পারো, কিন্তু ঐ আয়ুধ তোমার পরিপাক করা অসম্ভব। আয়ুধ তুমি হজম করতে পারবে না। ঐ আয়ুধ তোমার উদর মধ্যের সমস্ত অন্ত্রগুলি ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে। তোমার হাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহ'লেও তোমার নিস্তার নেই। আমার মৃত্যু, তোমার মরণকেও সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনবে। যক্ষ, এখন বুঝতে পারছো, কেন আমার মৃত্যুভয় নেই ?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনে শ্লেষলোম কদর্য মুখখানা আরো কদর্য ক'রে ভাবতে থাকে :—তাই তো! ব্রাহ্মণকুমার ঠিকই বলেছে। এই পুরুষসিংহের দেহের মাংস আমি জীর্ণ করতে পারবো না। একে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। বলে :—

: ঠাকুর, তুমি যথার্থই বীরপুরুষ। তোমাকে মুক্তি দিলেম। তুমি স্বদেশে ফিরে যাও।

বোধিসত্ত্ব বলেন :—

: তা' তো হ'ল। কিন্তু যক্ষ, তোমার কি গতি হবে? তুমি পূর্বজন্মের কুকর্মের ফলে অতিলোভী, হিংসাপরায়ণ, জীবরক্ত-মাংসভুক্ যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছো। যদি এজন্মেও এইরকম কুকর্মে লিপ্ত থাকো, তাহ'লে তোমাকে এক পাপ থেকে আর এক পাপের মধ্যে যেতে হবে। অন্ধকারেই থাকবে তুমি। জ্ঞানালোকের পাবে না সন্ধান। তোমার সৌভাগ্য যে, আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। যখন সাক্ষাৎকার ঘটেছে, তখন একটা ব্যবস্থা আমি করবোই। তুমি আর কুকর্মে লিপ্ত

থাকতে পারবে না। দেখো—প্রাণিহত্যা মহাপাপ। প্রাণি-হত্যার বিষময় ফল, প্রেত বা অসুর জন্মলাভ। দৈবাৎ যদি মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, তাহ'লে অতীত-জীবনের পাপকর্মফলে আয়ু হয় অল্প। অল্প আয়ু বা অকালমৃত্যু পূর্বজন্মের অর্জিত দুষ্কৃতির ফল।

শুনে শ্লেষলোমের মনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। যম অপেক্ষাও পাষাণহৃদয় শ্লেষলোমের ভয়াল চক্ষু দু'টি সজল হয়ে উঠলো। বোধিসত্ত্ব এটা লক্ষ্য করলেন। তিনি কোমলকণ্ঠে ওকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সংযমী এবং 'পঞ্চশীলপরায়ণ' ক'রে তুললেন। জীবকুলের সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করবার জন্যই বোধিসত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন জন্ম নিয়েছিলেন। শুধু এই নয়। যক্ষ, দানবদেরও 'পঞ্চশীলের' শুভফল দেখিয়ে জঘন্য কার্য থেকে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রেও তাই হ'ল। সেই শ্লেষলোম যক্ষের মন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন ক'রে তাকে সেই অরণ্যের দেবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ওকে পূজার উপহার গ্রহণ করবারও অধিকার দিলেন বোধিসত্ত্ব। পরিশেষে যক্ষকে সর্বপ্রকার রিপু দমন ক'রে রাখতে উপদেশ দিয়ে বললেন:—বাবা শ্লেষলোম, এজীবনে যদি আমার কথা শোনো, তাহ'লে পরজন্মে হয়তো আবার আমার সংস্পর্শে এসে তোমার অর্হত্ব লাভ হ'তে পারে।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলেন।

এরপর কত বছর যে কেটে গেলো তার কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।

শ্লেষলোম যক্ষ বোধিসত্ত্বের উপদেশমত অরণ্যে সৎ-ভাবে জীবন কাটিয়ে যেটুকু সুকৃতি অর্জন করেছিল, তার ফলে সে এবার কোশলরাজের পুরোহিত ভার্গবের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলো। নাম হ'ল—অহিংসক। তার আর একটি নাম হয়েছিল—অঙ্গুলিমাল। এই নাম কেন হয়েছিল, সেই কথাই এখন বলছি।:—

অহিংসক যখন ভূমিষ্ঠ হয়, রাজধানীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র থেকে অগ্নিশিখা নির্গত হ'তে থাকে। সেই দৃশ্য অবলোকন ক'রে দৈবজ্ঞেরা ভবিষ্যৎ-বাণী করলেনঃ—অহিংসক কালে একজন ভয়ানক দস্যু হবে। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ-বাণী শুনে পিতা ভার্গব স্থির করলেন যে, তিনি এমন কুলাঙ্গার পুত্রকে জীবিত রাখবেন না। ভার্গবের এই নৃশংস মনোবৃত্তির কথা জানতে পেরে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ শিউরে উঠলেন। তিনি ভার্গবকে ডেকে বললেনঃ—ছি ছি! একি মনোবৃত্তি আপনার! আপনি এমন কাজ করবেন না। পুত্রহত্যা মহা পাপ। আপনি আমার অনুরোধে এই নীচ কার্য থেকে ক্ষান্ত হ'ন।...

ভার্গব কোশলরাজের অনুরোধে এই নৃশংস সঙ্কল্প থেকে বিরত হলেন।

যাহ'ক, অহিংসকের বয়স বাড়তে বিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য গেলো তক্ষশিলা-নগরে। বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায় তার ছিল

অসাধারণ। অধ্যাপকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল সে। অধ্যাপকের আরো শিষ্য ছিল। তারাও অহিংসকের সঙ্গে অধ্যাপকের পাদমূলে ব'সে বিদ্যালাভ করতো। কিন্তু অহিংসকের বুদ্ধি ও অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ ছিল ব'লে তার সহপাঠীরা তার সঙ্গে পেরে উঠতো না। এতে একটা বিষময় ফল দেখা গেলো। অহিংসকের সহপাঠীরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। কিসে অধ্যাপকের কাছে অহিংসককে হীন প্রতিপন্ন করলে অধ্যাপকের বিতৃষ্ণা অহিংসকের উপর পড়বে, তার-ই উপায় তারা চিন্তা করতে থাকে।

উপায় তারা আবিষ্কার ক'রে ফেলে। একটা বিশ্রীরকম মিথ্যা অপবাদ অহিংসকের বিরুদ্ধে দিয়ে অধ্যাপকের মন একেবারে বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দিলে। অধ্যাপক তখন অহিংসককে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তার ইচ্ছা নয় যে, তিনি অহিংসককে আর শিক্ষা দান করেন। কিন্তু নিজের এই অভিপ্রায় সোজাসুজি ব্যক্ত না ক'রে অন্য ভাবে অহিংসককে বললেন ;—

ঃ বৎস, অহিংসক! তুমি যদি হাজারটি লোকের প্রাণ হরণ ক'রে প্রমাণস্বরূপ তাদের প্রত্যেকের এক-একটি আঙুল এনে আমায় দেখাতে পারো, তবেই তোমাকে বিদ্যা দান করবো। যদি না পারো, তাহ'লে আমার এইস্থান তোমাকে ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হবে।

বিদ্যালাভ থেকে বঞ্চিত হবে, এই আশঙ্কায় অহিংসকের হৃদয় অন্তর্যাতনায় টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। গুরুকে প্রসন্ন করলে

তিনি যদি বিদ্যা দান করেন, সেই কারণে অহিংসক অরণ্যে গিয়ে নরহত্যায় প্রবৃত্ত হ'ল। ঐ অরণ্যের মধ্যে আটটি আলাদা আলাদা রাজপথ আলাদা আলাদা পথ দিয়ে একসঙ্গে মিশেছে একটি স্থানে। আটটি রাজপথের সঙ্গমস্থল। এই রাজপথের এতগুলি মুখ থাকায় প্রথম প্রথম লোকের অভাব হ'ত না। বহু লোক এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করতো। অহিংসক এক-একটি নরহত্যা করে। এক-একটি আঙুল হাত থেকে কেটে আনে গুরুর কাছে। নিহত ব্যক্তিদের হাতের আঙুল কেটে নিতো ব'লে অহিংসকের আর একটি নাম হ'ল—অঙ্গুলিমাল।

অঙ্গুলিমালের (অহিংসকের) নৃশংসতায় অচিরেই সমগ্র কোশলরাজ্য ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। লোকে আর রাজ-পথে পা' দেয় না। সকলেরই মনে নিদারুণ বিভীষিকা! গভীর বিষাদের ঘন কৃষ্ণচ্ছায়া সকলের মনের সুখশান্তি অপহরণ ক'রে নিলে। কোশলরাজ প্রসেনজিতের কানে আসে এই মর্মান্তিক সংবাদ। তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। নিষ্ঠুর অঙ্গুলি-মালকে (অহিংসককে) নিহত করবার জন্য কিছু সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন প্রসেনজিৎ। ভার্গব আগেই বুঝেছিলেন—এই নরঘাতক দস্যু তাঁর পুত্র ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু জেনেশুনেও ভার্গব পুত্রের জীবন রক্ষা করবার জন্য কোনো চেষ্টা করলেন না।

কিন্তু মার প্রাণ পুত্রের এই বিপদে অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি আলুথালুবেশে পাগলিনীর মতো ছুটতে লাগলেন রাজপথ দিয়ে।

তখন ভগবান গৌতমবুদ্ধ জেতবনে অবস্থান করছিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সমস্তই তাঁর দিব্যচক্ষুর উপর প্রতিভাত হচ্ছে। তিনি ধ্যানযোগে সমস্তই দেখতে পেলেন। বিচলিত হয়ে উঠলেন ভগবান গৌতমবুদ্ধ। মনে মনে বললেন ঃ— এজন্মে সে যা'ই হ'ক না কেন, অঙ্গুলিমালের পূর্বজন্ম-অর্জিত এমন সুকৃতি আছে যে, এজন্মে আমার কাছে থেকে সদুপদেশ শুনলেই সে অর্হত্ত্ব লাভ করতে পারবে। কিন্তু ওর প্রকৃতি এখন এমনি ভীষণ হয়ে আছে যে, সুবিধা পেলেই নিজের মাকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না। এই রমণীর প্রাণ রক্ষা করাই আমার কর্তব্য।

ভগবানবুদ্ধ সামান্য ভিক্ষুর বেশে অঙ্গুলিমালের (অহিংসকের) অরণ্যের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

সেই দিনটি অঙ্গুলিমালের (অহিংসকের) নরহত্যাব্রত উদ্‌যাপনের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য দিন। হিসাব ক'রে দেখলে সে—গতকাল পর্যন্ত ন'শো' নিরানব্বইটি মানুষ হত্যা করেছে। বাকী মাত্র একটি। একটি নরহত্যা করতে পারলেই ওর এই নরহত্যাব্রতটি সুষ্ঠুভাবেই উদ্‌যাপিত হয়। কাজেই, আজ-ই এই ব্রতটি সম্পূর্ণ করতে অঙ্গুলিমাল বদ্ধপরিকর হ'ল।

এমনি সময়ে···

ভিক্ষুবেশী বুদ্ধকে দেখতে পায় অঙ্গুলিমাল। আনন্দে ওর হৃদয় নেচে উঠলো। আজ-ই নরহত্যাব্রতটি তাহ'লে সম্পূর্ণ হবে।

বাতাসের বেগে অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্রমাগত ছ' ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রেও সে বুদ্ধকে ধরতে পারে না।

অঙ্গুলিমালের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। তাই তো! একী হ'ল? অশ্ব, হরিণ প্রভৃতি দ্রুতগামী প্রাণীকে বেগে সে অতিক্রম করছে, আর ওঁকে পারলে না ধরতে!

অঙ্গুলিমাল তখন একটা বিকট চীৎকারে ভিক্ষুবেশী বুদ্ধকে থামতে বলে।

বুদ্ধ দাঁড়ালেন। অঙ্গুলিমালকে উদ্দেশ ক'রে তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বললেন :—

: তুমি যেখানে আছো, দাঁড়িয়ে থাকো সেখানে। এক পা'ও অগ্রসর হ'য়ো না।

অঙ্গুলিমাল সেকথা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বুদ্ধের দিকে এগিয়ে আসতে পা' বাড়ায়। কিন্তু একী হ'ল! তার পা' যে নড়ে না! বিস্তর চেষ্টা করে অঙ্গুলিমাল। ওর হুঙ্কার আর দাপাদাপিতে পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো, তবুও সে এক পা'ও অগ্রসর হ'তে পারলে না। যেখানে ছিল সে, সেখানেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তম্ভিত হয়ে রইলো দাঁড়িয়ে। তখন সময় বুঝে বুদ্ধ তাকে সত্নপদেশ দিতে লাগলেন। শুনে যম অপেক্ষাও

নিষ্ঠুর অঙ্গুলিমালের পাষাণহৃদয়ের গভীরতম স্থান পর্যন্ত এক অব্যক্ত করুণারসে সিঞ্চিত হয়ে উঠলো। অঙ্গুলিমালের ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ক্রূর এবং হিংস্র চক্ষুদু'টি অশ্রুর সংস্পর্শে ক্রমশঃ ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। দু'টি হাত নিজের মুখের উপর চাপা দিয়ে অঙ্গুলিমাল শিশুর মতোই আজ কাঁদতে লাগলো। বুদ্ধ ওকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর নিজের ডানহাতখানি আকাশের দিকে তুলে ঃ—'এহি ভিক্ষো' এই বলে অঙ্গুলিমালকে সন্ন্যাসধর্ম প্রদান করলেন।

জেতবনের বৌদ্ধ আশ্রমে এখন দেখা যায় অঙ্গুলিমালকে।

প্রসেনজিৎ জানেন না যে, সেই নরঘাতক অঙ্গুলিমালের আশাতীত পরিবর্তন হয়েছে ভগবানবুদ্ধের করুণাতে। তিনি জানেন—এখনো অঙ্গুলিমাল নরহত্যা করবার জন্য অরণ্যেই বিচরণ করছে। প্রসেনজিৎ চান ওকে দমন করতে। কিন্তু কি ক'রে ওকে দমন করা যেতে পারে, সেটা জানবার জন্য একদিন এলেন ভগবানবুদ্ধের কাছে। ভগবানবুদ্ধ তখন জেতবনেই ছিলেন।

প্রসেনজিৎকে দেখে ভগবানবুদ্ধ স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—

ঃ ব্যাপার কি মহারাজ? বিম্বিসার কি আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে আরম্ভ করেছেন? আপনি কি বৈশালীর লিচ্ছবিরাজাদের ভয়ে ভীত হয়েছেন?

প্রসেনজিৎ বিনয়সূচক-কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন :—

: আজ্ঞে না। সেরকম কিছু হয় নি। তবে অঙ্গুলিমালকে দমন করা দরকার হয়ে পড়েছে। সে সাংঘাতিক দস্যু। নরহত্যায় তার পিপাসা মেটে না। প্রভু, সেই ভয়ঙ্কর দস্যুকে দমন করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আপনার কাছে এসেছি। দয়া ক'রে পরামর্শ দিন—কি ক'রে ওকে দমন করা যায়।

শুনে ভগবানবুদ্ধ সেই ভাবেই বললেন :—

: মনে করুন অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হয়েছেন। বলুন তো, তাহ'লে ওর সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

: সে যদি ভিক্ষু হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি তাকে সমুচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করবো। বললেন প্রসেনজিৎ।

একটু মৌন থেকে আবার বললেন প্রসেনজিৎ :—

: কিন্তু, সেই দুর্দ্ধর্ষ অঙ্গুলিমালকে আপনার শিষ্যরূপে আমি কল্পনাও করতে পারি নে। প্রভু, এযে অসম্ভব !

ভগবানবুদ্ধ হাসলেন। মধুর-স্বরে বললেন :—

: মহারাজ, অঙ্গুলিমাল এখন সত্যই আমার শিষ্য। সে এখন আশ্রমে আছে।

প্রসেনজিৎ ভয়ে আঁৎকে উঠলেন :—কী সর্বনাশ ! অঙ্গুলিমাল এখানে ?

ভগবানবুদ্ধ তাঁকে অভয় দিলেন। সঙ্গে ক'রে তাঁকে নিয়ে এলেন অঙ্গুলিমালের কাছে। প্রসেনজিৎ মহানন্দে নিজের মণিখচিত কটিবন্ধ খুলে সেটি অঙ্গুলিমালকে উপহার দিতে

গেলেন। কিন্তু, অঙ্গুলিমালের এখন অভিনব পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন বিষয়বাসনাহীন বৌদ্ধভিক্ষু। প্রসেনজিতের সেই অমূল্য কটিবন্ধ গ্রহণ করলে না। সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলে অঙ্গুলিমাল।

অঙ্গুলিমালের এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে প্রসেনজিৎ আজ আর একবার নূতন ক'রে ভগবানবুদ্ধকে দেখতে পেলেন! বললেন প্রসেনজিৎ আবেগভরে :—

: প্রভু, এ আপনার-ই অপূর্ব মহিমায় সম্ভব হয়েছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার! আজ দেখছি—পাষাণে কর্দম দেখা দিয়েছে। আজ দেখছি—লোভী দানশীল হয়েছে। আজ দেখছি—পাপী হয়েছে পুণ্যবান। প্রভু, এ আপনার-ই অনন্ত মহিমা! আমি রাজদণ্ডদ্বারা লোকের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি। কিন্তু কৈ, তাতে তো তাদের চরিত্র সংশোধিত হয় না! জয় প্রভু, আপনার জয়—জয়, ভগবানবুদ্ধের জয়!

ভগবানবুদ্ধের অসীম কৃপার ফলে অল্পসময়ের মধ্যেই অঙ্গুলিমাল (অহিংসক) অর্হত্ব লাভ করলো।



সুবর্ণহংস-জাতক

পুরাকালের কথা। বারাণসী-নগর। রাজা—ব্রহ্মদত্ত। রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব কোনো ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেন। বোধিসত্ত্বের যখন বিবাহের বয়স হ'ল, তখন তিনি ব্রাহ্মণবংশেরই একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। যথাসময়েই বোধিসত্ত্বের তিনটি কন্যা হ'ল। বড়োটির নাম রাখলেন—নন্দা। মেজোটির—নন্দবতী। ছোটোটির নাম হ'ল —সুন্দরীনন্দা।

বোধিসত্ত্ব একদিন সময় বুঝে মানবদেহ ত্যাগ করলেন।

তাঁর স্ত্রী আর তিনটি কন্যা প্রতিবেশীদের ঘরে কাজ-কর্ম ক'রে কোনোরকমে জীবন ধারণ করতে লাগলেন।

মানবদেহ ত্যাগ ক'রে বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

এবার জাতিস্মর হলেন তিনি।

হংসরূপী বোধিসত্ত্ব বড়ো হ'তে থাকেন। সোনার পালকে ওঁর গা' ছেয়ে যায়।

একদিন বোধিসত্ত্ব নিজের রমণীয় দেহ দেখে ভাবতে লাগলেন :—আমি পূর্বজন্মে কি ছিলেম ?...

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গতজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। জাতিস্মর বোধিসত্ত্বের গতজন্মের সবকথাই মনে পড়ে। তিনি মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনটি কন্যাও তাঁর ছিল।

মায়া এসে বোধিসত্ত্বের মনে দোলা দেয়।—তাই তো ! আমার স্ত্রী-কন্যারা আমার অভাবে কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছে, একবার দেখা দরকার তো !

অনুসন্ধান করতে থাকেন বোধিসত্ত্ব। সন্ধান পান। জানতে পারেন—ওঁর স্ত্রী পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে কায়ক্লেশে জীবন কাটাচ্ছেন। কন্যারাও তাই করছে।

ব্যথিত হয়ে উঠলেন বোধিসত্ত্ব—সেই সুবর্ণহংসরূপী বোধিসত্ত্ব ! আহা ! কত কষ্টেই না স্ত্রী-কন্যাদের জীবন কাটছে !

ভাবলেন বোধিসত্ত্ব :—

—আমার গায়ের পালকগুলি সোনার। আমি এক-একদিন একটি ক'রে ওদের পালক দেবো। এই পালক বিক্রয় ক'রে ওরা সুখে জীবন কাটাতে পারবে।

মনে মনে এই সঙ্কল্প ক'রে বোধিসত্ত্ব কুঁড়ে ঘরের চালে উড়ে গিয়ে বসলেন। কন্যারা তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করে :—

: প্রভু, আপনি কোথা থেকে এলেন ?

বোধিসত্ত্ব বললেন ঃ—

ঃ আমি তোমাদের পিতা। মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মেছি। তোমরা সব কেমন আছো দেখতে এসেছি। দেখো, এখন থেকে আর তোমাদের পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে দিন কাটাতে হবে না। আমি এক-একটি পালক দেবো। এই পালক বিক্রয় ক'রে তোমাদের বেশ সচ্ছলভাবেই জীবন কাটবে।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব নিজের গা' থেকে একটি সোনার পালক দিলেন।

আর তাঁকে দেখা গেলো না, বোধিসত্ত্ব উড়ে গেলেন।

এরপর থেকে প্রায়ই এমনি হয় ঃ—

বোধিসত্ত্ব আসেন সেই কুঁড়ে ঘরের চালে। তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের একটি ক'রে নিজের গা' থেকে সোনার পালক দেন। দিয়ে আবার উড়ে কোথায় জানি চ'লে যান।

বোধিসত্ত্বের স্ত্রী-কন্যাদের দুঃখ আর নেই। পরম সুখে অনাবিল শান্তিতে দিন কাটে। বিস্তর অর্থ হাতে এসে জমতে থাকে।

কিন্তু লোভ বড়ো ভয়ানক জিনিষ।

একদিন···

ব্রাহ্মণী কন্যাদের বলেন ঃ—

ঃ ইতর প্রাণীদের চরিত্র বোঝা দায়। তোদের বাবা কখন হঠাৎ এখানে আসা বন্ধ করবে, তা' কে বলতে পারে? এক কাজ করা যাক্। এবার যখন তোদের বাবা এখানে

আসবে, তখন আমরা সকলে মিলে তার গায়ের সোনার পালকগুলি তুলে নেবো।

মার কথা শুনে তিন ভগিনীর-ই মন অব্যক্ত বেদনায় টন্‌-টন্ ক'রে উঠলো :—

: বলো কি মা? তাও কখনো হয়? বাবার গা' থেকে পালকগুলি তুলে নিলে তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করবেন না! না, এমনি জঘন্য কাজ আমরা মরে গেলেও পারবো না। দরকার নেই আমাদের টাকা-কড়ি! ছি ছি! একী নীচ মনোবৃত্তি তোমার?

মার মন তখন অর্থের দিকে। আরো অর্থ তাঁর চাই। তিনি কন্যাদের কথা শুনে বিকৃতকণ্ঠে বললেন :—

: না পারলি তো বয়েই গেলো! কেন, আমি নিজে পারবো না? চাইনে তোদের সাহায্য। আমি একাই একাজ করবো।

ব্রাহ্মণী হংসরূপী বোধিসত্ত্বের আগমনের প্রত্যাশায় থাকেন। বোধিসত্ত্ব একদিন আবার এলেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে বললেন :—

: আর্যপুত্র, আমার কাছে আসুন।

বোধিসত্ত্ব এগিয়ে আসেন ব্রাহ্মণীর কাছে।

ব্রাহ্মণী খপ্ ক'রে ধ'রে ফেললেন ওঁকে। তারপর নির্দয়ভাবে ওঁর গা' থেকে সমস্ত পালকগুলি তুলে নিলেন। কিন্তু অতীব বিস্ময়ের কথা এই যে, বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালকগুলি তোলা হ'ল ব'লে একটি পালকও আর সোনার পালক রইলো

না। সবগুলি-ই নিমেষের মধ্যেই বকের পালকের মতো শাদা হয়ে গেলো।

বোধিসত্ত্ব উড়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উড়তে পারেন না। ব্রাহ্মণী তাই দেখে একটি বড়ো জালার মধ্যে তাঁকে ফেলে রেখে খাবার দিতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্বের নূতন পালক উঠলো। সে-পালকগুলি সোনার পালক নয়। সবগুলি-ই সাধারণ পালক।

একদিন অবসর বুঝে বোধিসত্ত্ব সেই জালার ভিতর থেকে বেরিয়ে উড়ে চলে গেলেন। আর এখানে এলেন না।

একজন উপাসক ভিক্ষুণীদের রসুন দান করবার সঙ্কল্প ক'রে ক্ষেত্রপালককে বলেছিলেন :—যদি ভিক্ষুণীরা রসুন চাইতে আসেন, তাহ'লে প্রত্যেককে আটটি, দশটি বা বারোটি রসুন দেবে। এর বেশী নয়। ভিক্ষুণীরা সেই জন্য কখনো তাঁর বাড়ী, কখনো তাঁর ক্ষেত্রে যেতেন।

একদিন কি একটা পর্ব-উপলক্ষে সেই উপাসকের বাড়ী রসুন ফুরিয়ে গিয়েছিল। ভিক্ষুণী স্থূলনন্দা দলবল নিয়ে রসুনের জন্য উপস্থিত হয়ে শুনলেন, বাড়ীতে আর রসুন নেই। সমস্তই ফুরিয়েছে। কাজেই, ওঁদের যেতে হবে ক্ষেত্রে। স্থূলনন্দা ক্ষেত্রে গিয়ে, বলা নেই, কওয়া নেই—ইচ্ছামত অনেক রসুন তুলে নিলেন। ক্ষেত্রপাল সেইখানেই ছিল। ব্যাপার দেখে সে

বিরক্ত হয়ে বললে ঃ—কি রকম মেয়ে এই ভিক্ষুণী ? বলা নেই, কওয়া নেই—যত খুশী রসুন তুলে নিয়ে গেলেন ?

ভগবান গৌতমবুদ্ধ তখন অবস্থান করছিলেন জেতবনে। ভিক্ষুরা স্থূলনন্দার কথা জানতে পেরেছিলেন। তাঁরা স্থূলনন্দার লোভের কথা ভগবান গৌতমবুদ্ধকে বললেন। শুনে তিনি তাঁদের বললেন ঃ—ভিক্ষুগণ, স্থূলনন্দা যে এ-জন্মেই অতি লোভ দেখিয়েছে, তা' নয়। পূর্বজন্মেও সে অতি লোভের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু, লোভ ত্যাগ করা দরকার। লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু। এই ব'লে তিনি ঐ পূর্বজন্মের কথা বললেন।

ঐ অতীত-জন্মে ভগবান গৌতমবুদ্ধ ছিলেন—সুবর্ণহংস। ঐ অতীত-জন্মে স্থূলনন্দা ছিলেন—ব্রাহ্মণী।



একপর্ণ-জাতক

ব্রহ্মদত্ত তখন বারাণসীর রাজা।

বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে 'উদীচ্য' ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করলেন। বয়স বাড়তে তিনি তক্ষশিলা-নগরে যান। সেখানে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে বারাণসীতে নিজের গৃহে ফিরে আসেন। তারপর পিতামাতার মৃত্যু হ'লে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে চ'লে যান হিমালয়ে। সেখানে ধ্যানাদির দ্বারা তিনি বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

দীর্ঘকাল হিমালয়ে বাস করবার পর বোধিসত্ত্ব কি মনে ক'রে বারাণসীতে ফিরে এলেন। ব্রহ্মদত্তের উদ্যানে বাস করতে থাকেন। ব্রহ্মদত্ত কিন্তু একথা জানেন না।

একদিন বোধিসত্ত্বকে তপস্বীর 'বেশে' ব্রহ্মদত্তের প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষাপাত্রসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। প্রাসাদের

বাতায়নে ব্রহ্মদত্ত এমনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো বোধিসত্ত্বের দিকে। তাঁর চেহারা, অপূর্ব জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল এবং মনোরম হাব-ভাব দেখে ব্রহ্মদত্তের চোখ জুড়িয়ে যায়। তিনি একজন অমাত্যকে ডেকে বললেন :—

: প্রাসাদদ্বারে ঐ যে তপস্বীকে দেখছো, ওঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

অমাত্য ব্রহ্মদত্তের আদেশ পালন করেন। যান বোধিসত্ত্বের কাছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করলেন বোধিসত্ত্বকে। তাঁর হাত থেকে ভিক্ষাপাত্রটি নিলেন নিজের হাতে।

: আপনি কি চান? জিজ্ঞাসা করেন বোধিসত্ত্ব।

: রাজা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার সঙ্গে তাঁর কাছে চলুন। বলেন অমাত্য।

বোধিসত্ত্ব ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন। বললেন :—

: প্রাসাদের ভিতর আমি কখনো যাই নে। আমি তপস্বী। হিমালয়ে বাস করি। আমার রাজভবনে গতিবিধি নেই!

অমাত্য নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন।

রাজাকে জানালেন সেকথা।

শুনে রাজা বললেন :—

: আমার কোনো 'কুলোপগ' তপস্বী (যিনি গৃহে প্রায়ই ভিক্ষা করতে আসেন এবং সকলকে ধর্ম উপদেশ দেন) নেই। ঐ তপস্বীকে এখানে নিয়ে এসো। উনি আমার 'কুলোপগ' হবেন।

অমাত্য আবার আসেন বোধিসত্ত্বে কাছে। রাজার প্রার্থনা বোধিসত্ত্বকে জানালেন অমাত্য।

বোধিসত্ত্ব এবার কোনো আপত্তি করেন না। অমাত্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রাসাদের ভিতরে আসেন।

বোধিসত্ত্ব এসেছেন ব্রহ্মদত্তের কাছে।

দেখা গেলো, ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বকে পরম ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।

বোধিসত্ত্বকে ব্রহ্মদত্ত স্বর্ণ-সিংহাসনে বসালেন। নিজের জন্য যে খাদ্য প্রস্তুত হয়েছিল, তা' পরম সমাদরে বোধিসত্ত্বকে খেতে দিলেন।

রাজা একসময়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—

ঃ তাপস, আপনার আশ্রম কোথায় ?

বোধিসত্ত্ব জবাবে বললেন ঃ—

মহারাজ, আমি থাকি হিমালয়ে। বাসনা হওয়ায় বারাণসীতে এসেছি দিনকয়েকের জন্য। সময় হ'লেই আবার ফিরে যাবো হিমালয়ে।

রাজা কি ভেবে আবার প্রশ্ন করলেন ঃ—

ঃ এখন আপনি যাবেন কোথায় ? হিমালয়ে ফিরে যাবেন কি ?

ঃ ইচ্ছা নেই। সামনেই বর্ষাকাল। বর্ষাকালে থাকবার উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করছি। বললেন বোধিসত্ত্ব।

ঃ ভালো কথা। তবে দয়া ক'রে আমার-ই উদ্যানে বাস করুন। সেই ভালো। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে বললেন ব্রহ্মদত্ত।

বোধিসত্ত্ব সম্মত হলেন।

রাজা ব্রহ্মদত্তের একটি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির পুত্র ছিল। যেমনি অসভ্য, তেমনি উগ্র, তেমনি নিষ্ঠুর। পিতা থেকে আরম্ভ ক'রে লোকজন, আত্মীয়-স্বজন সবাই বিস্তর চেষ্টা করেছেন তাকে ভালো করবার জন্য। সব নিষ্ফল। কোনো ফল হয় নি। রাজা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন বোধিসত্ত্বকে পেয়ে আর একবার চেষ্টা করবেন—এই স্থির করলেন।

একদিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মদত্ত আসেন বোধিসত্ত্বের কাছে। পুত্রকে দেখিয়ে ব্রহ্মদত্ত বলেন :—

: তাপস, আমার এই ছেলেটির স্বভাব ভালো নয়। কারুর শাসন মানে না। এর অত্যাচারে রাজ্যসুদ্ধ সবাই অতিষ্ঠ। আপনাকে এর স্বভাবটি ভালো ক'রে দিতে হবে।

এই ব'লে ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বের হাতে পুত্রকে সমর্পণ ক'রে উদ্যান থেকে বেরিয়ে এলেন।

বোধিসত্ত্ব ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে উদ্যানে বেড়াচ্ছেন। এদিকে আসেন। ওদিকে যান। হঠাৎ দেখতে পান একটি নিমের চারা। দু'পাশে মাত্র দু'টি পাতা বেরিয়েছে।

বোধিসত্ত্ব রাজপুত্রকে উদ্দেশ ক'রে বললেন :—

: বাবা, এই চারার একটি পাতা খেয়ে দেখো তো আস্বাদ কেমন!

রাজপুত্র বোধিসত্ত্বের আদেশ পালন করে। নিমপাতা মুখে দিয়েই তখনি থু-থু ক'রে ফেলে দেয় মাটিতে।

বোধিসত্ত্ব মনের ভাব গোপন ক'রে জিজ্ঞাসা করেন :—

: কি হ'ল কুমার? অমন ক'রে নিমের পাতা ফেলে দিলে কেন মুখ থেকে?

রাজপুত্র মুখ বিকৃত ক'রে বললেন—

: মশাই, এই গাছটি একেবারে বিষে ভরা! বড়ো হ'লে না জানি কত লোকের সর্বনাশ করবে!

এই ব'লে সে তৎক্ষণাৎ নিমের চারাটি হাত দিয়ে উপড়ে ফেললে।

তখন বোধিসত্ত্ব মৃত্নহাস্যে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন :—

: রাজপুত্র, এই নিমের চারাটি এখনি এমনি তিক্ত, বড়ো হ'লে না জানি আরো কি হবে, এই ভেবে তুমি চারাটিকে উপড়ে ফেললে। তুমি এই চারাটির সম্বন্ধে যা' করলে, এই রাজ্যের লোকেরাও তোমার সম্বন্ধে তাই করবে। ওরা ভাববে :— তুমি ছেলেবেলা থেকেই যখন এমন অসভ্য, উগ্র ও নিষ্ঠুর, তখন বড়ো হয়ে যখন পিতার সিংহাসনে উপবেশন করবে, তখন তোমার স্বভাব এখনকার চেয়ে আরো ভীষণ হবে। ওরা আরো ভাববে :—তোমাকে দিয়ে রাজ্যের কোনো ভালো কাজ হবে না। ওরা তোমাকে রাজ্য দেবে না। এই নিমের চারাটি যেমন তুমি ঘৃণাভরে মাটি থেকে আমূল উৎপাটিত করলে, ওরাও ঠিক সেইরকম ঘৃণাভরে তোমাকে রাজ্য থেকে দেবে

তাড়িয়ে। সেই জন্য তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি—এই নিমের চারার দৃষ্টান্তে নিজে সাবধান হও। নিজের স্বভাবটি শোধরাবার চেষ্টা করো।

পরম বিস্ময়ের কথা—বোধিসত্ত্বের ঐ উপদেশ-বাণীতে রাজকুমারের স্বভাব যায় বদলে। সে ভালো ছেলে হয়ে সুনাম অর্জন করলে।

ভগবান গৌতমবুদ্ধের আশ্রমে একদিন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় সমবেত হয়েছেন। দুষ্ট লিচ্ছবিকুমারের সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করছেন। ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করছেন ঃ—দেখো ভাই, দুষ্টপ্রকৃতির লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র তাঁর পিতামাতা, জ্ঞাতি-বন্ধুরা অন্তরিক চেষ্টা ক'রেও সংশোধন করতে পারেন নি। এই লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র সংশোধন করা, আর পাঁচ-ছয়টি মত্ত হস্তীকে সংযত করা একই কথা। শাস্ত্রকারেরা যথার্থই বলেছেন ঃ—যাঁরা মত্ত হস্তীকে দমন করতে পারেন, তাঁরা হয় মত্ত হস্তীকে সম্মুখে, নয়তো পিছনে, কিংবা উত্তরদিকে, বা দক্ষিণ-দিকে—যখন যেদিকে খুশী, সেইদিকে পরিচালিত করেন। যাঁরা অশ্বদের, গাভী এবং বলদগুলিকে সংযত করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তথাগত (ভগবান গৌতমবুদ্ধ) যাকে বিনয়ী, শিষ্টাচারী, শান্তির একনিষ্ঠ উপাসক ক'রে তোলেন, তাঁকে নিজের খুশীমত পরিচালিত করেন। তাঁর অনুগ্রহে শিষ্যেরা বাহ্যবস্তুর অসার চেহারাটা চোখের সুমুখে পরিষ্কার দেখতে পায়।

তখন লোভ, ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট করার মনোবৃত্তি মন থেকে ধুয়ে-মুছে যায়। মনে তখন আসে এক অনাবিল শান্তি। সারাবিশ্বে তখন শন্তির ললিতবাণী প্রচার করবার জন্য শিষ্যেরা উন্মুখ হয়ে উঠে। তথাগত নানাবিধ গুণসম্পন্ন। তাই, লিচ্ছবিকুমারকে সংশোধিত ক'রে ভালো মানুষ ক'রে দিয়েছেন।

ভিক্ষুরা যখন আশ্রমে পরস্পরে ঐকথা আলোচনা করছিলেন, তখন ভগবানবুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হলেন। ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় অবহিত হয়ে স্মিতমুখে বলতে লাগলেন ঃ—

ঃ দেখো বাবা, কোনো লোকেরই অকারণে রাগ করা উচিত নয়। নিষ্ঠুর, নির্দয় হওয়া ভালো নয়। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, নিপীড়ক হওয়া উচিত নয়। রাগে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। রাগ হ'লে মানুষ সব কিছুই করতে পারে। রাগী লোককে সবাই ভয় করে। কেউ ভালোবাসে না। কেউ শ্রদ্ধা করে না। এমন কি, নিজের মাতা, পিতা পুত্র, ভাই-ভগ্নিনী, স্ত্রী—আত্মীয়-স্বজন, যে-যেখানে আছে সকলের-ই অপ্রিয় হয় সে। মৃত্যুর পর সে ভোগ করে নরকযন্ত্রণা। তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সে-জন্মে তার দেহে ব্যাধির আর অন্ত থাকে না। সেই জন্য সকলেরই মৈত্রীভাবাপন্ন এবং পরহিতপরায়ণ হওয়া উচিত।

এই পর্যন্ত ব'লে ভগবান গৌতমবুদ্ধ থামলেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। আবার সেই ভাবেই বললেন ঃ—

ঃ বাবা, আমি যে কেবল এই প্রথম সত্নপদেশ দিয়ে লিচ্ছবিকুমারের চরিত্র সংশোধন করেছিলেম, তা' নয়। পূর্বজন্মেও ওকে সত্নপদেশ দিয়ে ওর চরিত্র সংশোধন করেছিলেম।

এই ব'লে ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁর অতীত-জীবনের ঐ ঘটনাটি শিষ্যদের বললেন।

ঐ অতীত-জীবনে বুদ্ধ ছিলেন সেই তপস্বী।

ঐ অতীত-জীবনে বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ ছিলেন—রাজা ব্রহ্মদত্ত।

ঐ অতীত-জীবনে বৈশালীর লিচ্ছবিকুমার ছিল—সেই দুষ্টকুমার,—রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র।



সে অতি প্রাচীনকালের কথা।

তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত।

বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে এক বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। নাম হ'ল—'পণ্ডিত'।

পূর্ণবয়স্ক হলেন বোধিসত্ত্ব। তখন আর একজন বণিকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হ'ল। এই বণিকের নাম—'অতিপণ্ডিত'।

এই দুই পণ্ডিতে মিলে ব্যবসা সুরু করলেন।

প্রায় পাঁচ-শো'টি গরুর গাড়ীতে পণ্য বোঝাই ক'রে ওঁরা দু'জনই যান দূর দেশে। সেখানে পণ্যগুলি বেশ চড়াদামে বিক্রয় ক'রে প্রচুর টাকা-কড়ি নিয়ে একসময়ে ফিরে এলেন বারাণসীতে।

এখন লাভের অংশ ভাগাভাগি করবার পালা।

অতিপণ্ডিত বলেন পণ্ডিতকে ঃ—

ঃ আমি লাভের দু'-অংশ নেবো। তুমি নেবে এক-অংশ। এর বেশী তুমি পাবে না। কিছুতেই না। আমার দু'-অংশ, তোমার এক-অংশ।

শুনে পণ্ডিত ক্ষণকাল নীরব হয়ে থাকেন। একসময়ে বলেন ঃ—

ঃ তুমি দু'-অংশ পাবে কেন ?

পণ্ডিত তখন নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে জোর দিয়ে বললেন ঃ—

ঃ কারণ, আমি অতিপণ্ডিত। তুমি শুধু পণ্ডিত। যে অতিপণ্ডিত, সে দু'-ভাগ, আর যে পণ্ডিত, সে এক-ভাগ পাবার উপযুক্ত।

পণ্ডিত বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত অতিপণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। বলেন ঃ—

ঃ সে কি ? এমন অদ্ভুত কথা তো জীবনে শুনিনি। পণ্যের মূল্যই বলো, আর গাড়ী-বলদই বলো—আমরা দু'জনেই তো সমান-সমান দিয়েছি। তবে তুমি কি ক'রে দু'-ভাগ পাবে ?

অতিপণ্ডিত ন্যায়বিচারের ধার ধারেন না। শুধু বারংবার বলতে থাকেন ঃ—

ঃ আমি অতিপণ্ডিত। তুমি শুধু পণ্ডিত। আমার চেয়ে নীচু। আমি পাবো লাভের দু'-ভাগ। তুমি পাবে এক-ভাগ।

নিতে হয় নাও। নয়তো পথ দেখো বাপু। ওর বেশী হবে না।

পণ্ডিত, অতিপণ্ডিতের কথা মেনে নিতে পারেন না। রাগ ক'রে ব'লে উঠেন :—

: পথ দেখবো মানে? আমাকে ঠকিয়ে নিতে চাও? দেখো, ভালো হবে না বলছি। গায়ের জোরে তুমি আমার সঙ্গে পারবে না। আমার ন্যায্য পাওনা না দিলে মারের চোটে পিঠ ভেঙ্গে দেবো।

অতিপণ্ডিতও রুখে দাঁড়ান :—

: ইস্! মারবে! দেখো না একবার গায়ে হাত দিয়ে। মারতে গেলে মার খেতে হয় জানো না?

পণ্ডিতও চীৎকার ক'রে বলেন :—

: ভালো কথায় আমার ন্যায্য পাওনা না দিলে শেষ পর্যন্ত তোমার পিঠ আর আস্ত থাকবে না। তুমি রাগই দেখাও, আর যাই করো, তোমায় ছাড়ছি নে।

অতিপণ্ডিত দেখলেন, ব্যাপার সুবিধার নয়। পণ্ডিত সত্যই যদি ওঁকে মেরে বসেন তাহ'লে গায়ের জোরে ওঁর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। অপিচ পিঠের হাড় কয়খানি হয়তো টুক্‌রা-টুক্‌রা হয়ে যাবে। ভেবেচিন্তে সবদিক রক্ষা করতে ধাঁ ক'রে একটা মতলব আবিষ্কার করলেন। বললেন :—

: দেখো ভাই পণ্ডিত—বিবাদে কাজ নাই। কাছাকাছি বৃক্ষদেবতা আছেন। কাল সকালবেলা আমরা দু'জনে

তাঁর কাছে যাবো। গিয়ে এই বিবাদের মীমাংসার প্রার্থনা করবো।

পণ্ডিত ঝগড়-বিবাদ ভালোবাসেন না। শান্তিতে যদি এই বিষয়টির সমাধান হয়, খুব ভালো কথা। তিনি অতি-পণ্ডিতের কথায় সম্মতি দিলেন।

রাত্রে অতিপণ্ডিত তাঁর পিতাকে সব কথা খুলে বললেন। পিতাকে নিয়ে যান একটি গাছের কাছে। গাছে একটি প্রকাণ্ড কোটর। সেখানে তাঁকে লুকিয়ে রাখেন। বলেন ঃ—

ঃ কাল সকালে আমরা এসে যখন জিজ্ঞারা করবো তখন আপনি বলবেন ঃ—অতিপণ্ডিত ছু'-ভাগ পাবেন।

পিতারও মতিগতি ভালো নয়। তিনি পুত্রের স্বার্থের দিকটাই দেখলেন!

পরদিন প্রভাতবেলায় অতিপণ্ডিত আসেন পণ্ডিতের কছে। হাসিহাসি মুখ! বলেন ঃ—

ঃ ভাই পণ্ডিত, আমাদের কার কি ভাগ প্রাপ্য, বৃক্ষদেবতা তা' জানেন। চলো, তাঁর কাছে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করি। তিনি যদি বলেন তোমাকে সমান ভাগ দিতে, তাই দেবো—দ্বিরুক্তি করবো না।

পণ্ডিত সরলমনে সেকথা বিশ্বাস করেন।

ছু'জনেই এলেন গাছের কাছে। অতিপণ্ডিত গাছটিকে সম্বোধন ক'রে বলেন ঃ—

ঃ হে বৃক্ষদেবতা, আমাদের বিবাদের মীমাংসা ক'রে দিন। তখন নকল বৃক্ষদেবতা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব পরিবর্তন ক'রে জিজ্ঞাসা করেন ঃ—

ঃ তোমাদের বিবাদ কি বলো ?

অতিপণ্ডিত বলেন ঃ—

ঃ দেবতা, এ ব্যক্তি—পণ্ডিত। আমি—অতিপণ্ডিত। আমরা একসঙ্গে ব্যবসা করেছিলেম। লাভের অংশ কে কত পাবে ব'লে দিন।

তখন নকল বৃক্ষদেবতা শেখান'মত সেইভাবেই বলেন ঃ—

ঃ পণ্ডিত পাবেন এক-ভাগ। অতিপণ্ডিত পাবেন ছু'-ভাগ।

বিচার শুনে পণ্ডিত (বোধিসত্ত্ব) স্তম্ভিত হলেন। তাঁর সংশয় হ'ল—সত্যই কি গাছের ভিতরে দেবতা আছেন? পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে।

গাছের শুষ্ক পাতা কুড়িয়ে গাছের কোটরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন পণ্ডিত। তারপর তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। আগুন ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলে উঠলে। আগুনের অসহ্য উত্তাপে নকল বৃক্ষদেবতা (অতিপণ্ডিতের পিতা) আর ভিতরে থাকতে পারলেন না। অর্দ্ধদগ্ধ-অবস্থায় গাছের কোটর থেকে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলেন। তিনি আক্ষেপ ক'রে তখন বলতে লাগলেন ঃ—

ঃ হে সাধু, তোমার 'পণ্ডিত' নাম সার্থক। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার ছেলের নাম 'অতিপণ্ডিত'। কিন্তু

সে-নাম—নিরর্থক। ওর বুদ্ধি ভালো নয়। ওর বুদ্ধির দোষেই আমার এই কষ্ট!

পণ্ডিত তাঁর প্রাপ্য-অংশ পেলেন।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করেছিলেন, তখন একদিন একটি অসাধু বণিককে উদ্দেশ ক'রে ঐ অতীত-কথা বলেন। ঐ অতীত-জন্মে ভগবান গৌতমবুদ্ধ ছিলেন—পণ্ডিত। অসাধু বণিক ছিলেন—অতিপণ্ডিত। ঐ অসাধু বণিককে অসাধুতা ত্যাগ করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন ভগবান গৌতমবুদ্ধ।



বোধিসত্ত্ব ধনবান শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করলেন। সে পুরাকালের কথা। সেই সময়ে ব্রহ্মদত্ত বারাণসীর রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্বও থাকতেন বারাণসীতে।

বোধিসত্ত্বের বয়স বাড়ে। শিক্ষাদীক্ষা শেষ করেন। বিবাহের বয়স হ'লে বিবাহ করলেন। যথাসময়ে তাঁর পুত্র হ'ল।

বোধিসত্ত্বের স্ত্রীর একটি দাসী ছিল। সেই দাসীরও একটি পুত্র ছিল। বোধিসত্ত্বের পুত্র এবং দাসীর পুত্র—দু'টি শিশু এক সঙ্গে লালিত-পালিত হ'তে লাগলো। বোধিসত্ত্বের পুত্র যখন পাঠশালায় যায়, তখন দাসীর পুত্রটিও তার সঙ্গে যায় পাঠশালায়।

দিন যায়। মাস কাটে। বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়।

দাসীর পুত্র লেখাপড়া মন্দ শিখলে না। ভালোই শিখলে। দেখে-শুনে বোধিসত্ত্ব ওকে নিজের বাড়ীর ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করলেন। দাসীর পুত্রের নাম—কটাহক।

বেশ কিছুদিন পর।

একদিন কটাহক নিজের মনেই বলে ঃ—

ঃ চিরকাল কি আমি এখানে ভাণ্ডারী হয়েই থাকবো ? না, তা' হয় না। আমাকে অন্য একটা কিছু দেখে নিতে হবে, যাতে ক'রে আমি জীবনে উন্নতি করতে পারবো। পারবো সুখে-শান্তিতে বাস করতে। এভাবে দিন যাপন করা ভালো লাগে না। ছাই ভাণ্ডারীর চাকরী! একটু দোষ হ'লেই প্রভু আমাকে বকাবকি করবেন। হয়তো কারাগারে পর্যন্ত ঠেলে দেবেন আমাকে। সারা জীবনটাই কি এমনি পরের চাকরী ক'রে আর ছাই-পাঁশ খেয়ে কাটবে ? না, এ হ'তে পারে না। আমাকে একটা উপায় বের করতেই হবে। …হ্যাঁ, মনে পড়েছে। 'প্রত্যন্ত প্রদেশে' শুনেছি প্রভুর একজন শ্রেষ্ঠী-বন্ধু থাকেন। একবার যাই না তাঁর কাছে। দোষই বা কি ?

এই পর্যন্ত আপনমনে ব'লে দুষ্ট কটাহক গালে হাত দিয়ে বহুক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। নিজের মনেই আবার বললে ঃ—

ঃ ঠিক হয়েছে। এখান থেকে প্রভুর হাতের লেখা জাল ক'রে একখানা নকল চিঠি লিখে নিয়ে যাই। সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে নিজেকে প্রভুর পুত্র ব'লে পরিচয় দেবো। তখন সেই শ্রেষ্ঠী সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে তাঁর জামাতা করবেন। প্রচুর ঐশ্বর্য পেয়ে আমি পরম সুখে দিন কাটাতে পারবো।

অসাধু কটাহকের আর বিলম্ব সহ্য হয় না। সে হুবহু বোধিসত্ত্বের হস্তাক্ষর নকল ক'রে লিখে ফেললে ঃ—আমার পুত্র আপনার কাছে যাচ্ছে। আপনার এবং আমার পরিবারের মধ্যে আদান-প্রদান-সম্পর্ক সংস্থাপিত করাই আমার অভিপ্রায়। আমার পুত্রকে আপনার জামাতা করলে খুশী হবো। আমি এখন নানা কাজে ব্যস্ত। এদিকে একটু সুবিধা করতে পারলেই আপনার ওখানে গিয়ে উঠবো।

সত্য-সত্যই একদিন কটাহক আসে সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে। গড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করে।

ঃ কে তুমি? কোথা থেকে আসছো, বৎস? জিজ্ঞাসা করেন শ্রেষ্ঠী।

ঃ আমি বারাণসী থেকে আসছি। আমি বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পুত্র। বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেয় প্রতারক কটাহক।

ঃ কিন্তু তোমার আগমনের উদ্দেশ্য? প্রশ্ন করলেন শ্রেষ্ঠী।

ঃ আমার কাছে তাঁর পত্র আছে। পত্র পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। বলে প্রবঞ্চক কটাহক।

ঃ পত্র? কৈ দেখি? এই ব'লে শ্রেষ্ঠী আগ্রহভরে কটাহকের দিকে ডানহাতটা বাড়িয়ে দেন।

কটাহক এর-ই অপেক্ষা করছিল। শ্রেষ্ঠীর হাতে পত্রখানি যত্নের সঙ্গে তুলে দিলে।

সরলপ্রাণ শ্রেষ্ঠী কটাহকের ছল-চাতুরী বুঝতে পারেন না।

ঐ পত্রখানি পড়ে তাঁর বন্ধুর নিজের হাতের লেখা মনে ক'রে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। মধুর-স্বরে বললেন ঃ—

ঃ এসো বাবা, এসো। বসো আমার পাশে। পথে কোনো কষ্ট হয় নি তো?

প্রতারক কটাহক মনে মনে হাসে। প্রতারণার সাফল্যে বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। মনের ভাবটি গোপন ক'রে আস্তে আস্তে বলে ঃ—

আজ্ঞে না। পথে কোনো কষ্ট হয় নি। কিন্তু, আপনি ভালো আছেন তো?

কটাহের সঙ্গে শ্রেষ্ঠীর কন্যার বিবাহ হয়ে গেলো। প্রচুর ধন-দৌলত পেয়ে কটাহক সেখানেই দিনের পর দিন কাটায়। সে এটার দোষ ধরে। ওটার দোষ ধরে। কিছুই তার আর মনের মতো হয় না।

একদিন···

খেতে বসেছে কটাহক। সুখাদ্য ওকে খেতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আহার্য মুখে দিয়েই সে তেলে-বেগুনে লাফিয়ে উঠলো। দু'হাত শূন্যের দিকে তুলে চীৎকার ক'রে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে ঃ—

ঃ এই অখাদ্য কখনো মানুষে মুখে দিতে পারে? এ যে কুকুরেরও অখাদ্য। যেমন এই অঞ্চলের সব লোক, তেমনি ওদের রুচিবোধ। ছি ছি! এই অখাদ্য দিয়েছে আমাকে খেতে!

আর একদিন…

ভৃত্য বস্ত্র এনেছে। চমৎকার পরিধেয় বস্ত্র। কিন্তু আশ্চর্য মনোবৃত্তি কটাহকের! সে ভৃত্যের হাত থেকে বস্ত্রখানি চিলের মতো ছোঁ মেরে নেয়। নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত ক'রে সে চীৎকার ক'রে উঠে :—

: মানুষ কখনো এবস্ত্র ব্যবহার করতে পারে? যেমন হয়েছে এ-অঞ্চলের সব লোক! বেরিয়ে যা' তুই আমার ঘর থেকে।

ভৃত্য তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে।

ওদিকে বোধিসত্ত্ব কটাহককে দেখতে পান না। বলেন :—
: কৈ, কটাহককে তো দেখতে পাচ্ছি নে! সে গেলো কোথায়?

কিন্তু শীঘ্রই বোধিসত্ত্ব ব্যাপারটার কিছুটা জানতে পারলেন। মন তাঁর খুবই খারাপ হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ বসে চিন্তা ক'রে ব'লে উঠলেন :—

: কটাহক খুবই অন্যায় কাজ করেছে। যাক্, যা' হবার হয়েছে। আমি তাকে ফিরিয়ে আনছি।

বোধিসত্ত্ব রাজার অনুমতি নিয়ে বিস্তর লোকজনসহ 'প্রত্যন্ত অঞ্চলে' যাত্রা করলেন। বারাণসীর শ্রেষ্ঠী 'প্রত্যন্ত-অঞ্চলে' আসছেন, এই সংবাদ শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কটাহকের কানেও এলো। সে ভারী দুর্ভাবনায় পড়লো। ভয়ও হ'ল বিলক্ষণ। ভয় হবারই কথা। কেন না, সে যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে লোভের বশবর্তী হয়ে। ভাবলে :—প্রভুর আসবার

কারণ আর কিছুই নয়। তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্যই আসছেন। কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালিয়ে যাবো ? না, পালাবোই বা কেন ? পালালে তো এখানে আর পারবো না আসতে! কোন্ লজ্জায় তখন আবার এখানে আসবো ? না, পালানো হবে না। এখন তবে কী করি ?…হ্যাঁ, ঠিক্ মনে পড়েছে। এই শঙ্কটে একমাত্র উপায় হ'ল—ফিরে গিয়ে প্রভুর শরণ নেওয়া। আগে যেমন তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করছিলেম, তেমনি করি। সেই ভালো। ফিরেই আমি যাই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কটাহকের যাওয়া হয় না। সে এখানে যে-ঐশ্বর্য লাভ করেছে, তা' ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে একরকম অসম্ভব ব'লেই মনে হ'ল। দাসীর পুত্র সে। ছল-চাতুরীর ফলে রাজ-ঐশ্বর্য সে ভোগ করছে। এসব ত্যাগ ক'রে পুনর্মূষিক হওয়াটা সে বুদ্ধিমানের কাজ ব'লে মনে করলে না।

কটাহক আসে তার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে। এমনি-এমনি আসে নি। মতলব ক'রেই এসেছে। বলে ঃ—

ঃ আমার বাবা আসছেন এখানে। আপনি তাঁর জন্য সবরকম ব্যবস্থা করুন। তাঁর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। তিনি মহাশয় ব্যক্তি। তাঁর আদর-যত্নের ত্রুটি হ'লে তিনি বড়োই অসন্তুষ্ট হবেন।

এই ব'লে সে একটুখানি চুপ ক'রে রইলো। বললে ঃ—

আমি মনে করছিলেম কি—আমি কিছু উপঢৌকন নিয়ে তাঁর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ করি। তাহ'লে বাবা খুব খুশী হবেন।

শ্বশুরমশাই শুনে বললেন ঃ—

ঃ সে তো খুব ভালো কথা বাবা। তুমি তাই করো।

প্রচুর ধন-দৌলত নিয়ে কটাহক বেরিয়ে পড়ে।

পথে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে তার দেখা। তাঁর পদধূলি নিয়ে কটাহক তাঁকে নিয়ে আসে নিরালা, নির্জনস্থানে।

বোধিসত্ত্বের পা' দু'টি দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে দুষ্ট কটাহক ঃ—

ঃ প্রভু, আমি বড়োই অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু কী করবো এখন! এই বিপুল ঐশ্বর্য থেকে নিজেকে মুক্ত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আপনি যত খুশী ধনরত্ন গ্রহণ করুন। কিন্তু, দোহাই প্রভু, আমার যে প্রতিপত্তি জন্মেছে এখানে, আসল কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়ে সেটুকু বিলোপ করবেন না।

হাজার হ'ক বোধিসত্ত্ব কটাহককে ভালোবাসতেন। দাসীর পুত্র হ'লে কি হবে, ওকে সেচক্ষে দেখতেন না।

বোধিসত্ত্ব কটাহককে আশ্বাস দিলেন। বললেন ঃ—

ঃ বৎস, আশ্বস্ত হও। আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি। আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করবো না। সেজন্য আমি এখানে আসি নি। আমার ধনরত্নে আর প্রয়োজন নেই।

বোধিসত্ত্ব আসেন সেই শ্রেষ্ঠীর কাছে। তাঁর বন্ধু শ্রেষ্ঠী। কটাহকের শ্বশুরমশাই—শ্রেষ্ঠী।

তিনি বোধিসত্ত্বকে সাদর-অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন ঃ—

ঃ আপনার পত্র পেয়ে আমি আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়েছি।

শুনে বোধিসত্ত্ব স্তম্ভিত হলেন। তিনি এ ব্যাপারটা জানতেন না। তাঁর পুত্র কটাহক? তিনি শ্রেষ্ঠীকে পত্র দিয়েছিলেন? এ সব কি?

বোধিসত্ত্ব মনের ভাব সংযত করলেন।

দিন কাটে।

একদিন···

বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠীর কন্যাকে আদর ক'রে কাছে ডাকলেন। বললেন ঃ—

ঃ এসো মা। আমার মাথায় বড়ো উকুন হয়েছে। উকুন মারো তো!

শ্রেষ্ঠীর কন্যা তাই করে।

এক সময়ে বোধিসত্ত্ব মধুর-স্বরে বললেন ঃ—

ঃ আমার ছেলেটি সুখ-দুঃখের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলছে তো মা? তার সঙ্গে বেশ সুখে-সম্প্রীতিতে সংসার করছো তো?

মেয়েটি বললে।—

ঃ বাবা, আমার স্বামীর অন্য কোনো দোষ নেই। কিন্তু যা' তাঁকে খেতে দেওয়া হয়, তারই তিনি বড়ো নিন্দা করেন।

ঃ ঐ তো ওর দোষ মা'! চিরকালের দোষ ওটি। কিন্তু ওর ঔষধ আছে। সেটি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। ঔষধটি আর কিছু নয়। একটি শ্লোক মাত্র। তুমি ওটি ভালো ক'রে শুনে

কণ্ঠস্থ ক'রে নাও। তোমার স্বামী যখন খেতে বসবে—তখন ঐ শ্লোকটি তাকে শুনিও। তাহ'লেই ওর ঐ দোষ আর থাকবে না।

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব ধীরে ধীরে কয়েকবার শ্লোকটি বললেন। কটাহকের স্ত্রীও সেটি কয়েকবার আবৃত্তি ক'রে কণ্ঠস্থ ক'রে নেয়। বলে :—

ঃ বাবা, শ্লোকটি তো মুখস্থ হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ তো বুঝতে পারলেম না।

বোধিসত্ত্ব একটু হাসলেন। বললেন :—

ঃ এর অর্থ তুমি বুঝবে না, মা'। কিন্তু যাকে উদ্দেশ ক'রে বলবে, সে ওর অর্থ বুঝবে। তাহ'লেই তো হ'ল, মা!

বোধিসত্ত্ব আর সেখানে রইলেন না, বারাণসীতে ফিরে গেলেন।

ওদিকে কটাহকের আস্ফালন আরো বেড়ে যায়। একদিন ওর স্ত্রী স্বামীর জন্য সেরা খাদ্য তৈরী করিয়ে নিজের হাতে পরিবেষণ করছে। কটাহক অভ্যাসবশতঃ সেই খাদ্যের বড়োই নিন্দা করতে লাগলো। তখন তার স্ত্রী বোধিসত্ত্বের শিখিয়ে দেওয়া শ্লোকটি স্বামীর কাছে বলতে থাকে। শ্লোক শুনে কটাহক তার অর্থ বুঝতে পারে :—

পরবাসীর দম্ভ-আস্ফালনের মাত্রাটা বেশী। মুখে যা' আসে, তাই বলে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসদুপায় অবলম্বন করে। কিন্তু মনিব যখন আবার আসবেন, তখন

এর প্রতিবিধান করবেন। কটাহক, তোমার এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। এর জন্য তুমি শাস্তি পাবেই।

মুখ শুকিয়ে যায় কটাহকের। সর্বনাশ! মনিব তাহ'লে আসল ব্যাপারটা স্ত্রীর কাছে ফাঁস ক'রে দিয়েছেন!

বিস্ময়ের কথা ঃ—সেইদিন থেকে কটাহকের যা' কিছু দম্ভ-আস্ফালন, যা' কিছু দুষ্ট অভিসন্ধি—সবই মন থেকে ধুয়ে-মুছে গেলো।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করেছিলেন, তখন একটি মিথ্যাবাদী, প্রতারক ভিক্ষুকে সদুপদেশ দিয়ে তাকে ভালো করবার জন্যই ঐ অতীত-কথা বর্ণনা করেন।

সেই অতীত-জন্মে ভগবান গৌতমবুদ্ধ ছিলেন—বারাণসীর শ্রেষ্ঠী।

সেই অতীত-জন্মে মিথ্যাবাদী ভিক্ষুটি ছিল—কটাহক।



পুরাকালের কথা।

তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত।

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। নাম হ'ল—শীলবান্‌কুমার।

দিন যায়। মাস কাটে। বছরের পর বছর যায়। শীলবান্‌কুমার ষোল বছরে পড়লেন।

পিতার মৃত্যুর পর শীলবান্‌কুমার রাজা হলেন বারাণসী-নগরের। তখন তাঁর নাম হ'ল—রাজা মহাশীলবান্।

রাজা মহাশীলবান্ নগরের চারিটি দ্বারে চারিটি, মধ্যভাগে একটি এবং রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটি দানশালা নির্মাণ করালেন। এই সব দানশালায় তিনি স্বহস্তে অনাথ-আতুরদের অন্ন দান করতেন। তাঁর নানাপ্রকার গুণ ছিল। অন্যায় কাজ নিজে কখনো করতেন না। অন্যে যাতে অন্যায় কাজ না

করে, তার জন্য সকলকে সদুপদেশ দিতেন। এ সত্ত্বেও যদি কেউ কোনো গর্হিত কাজ করতো, তাহ'লে সেই কাজের জন্য তাকে শাস্তি দিতেন।

একদিন রাজা মহাশীলবানের এক অমাত্য একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ ক'রে ফেলে। রাজা ওর অপরাধের কথা লোকমুখে শুনলেন। কিন্তু লোকের কথা তিনি বিশ্বাস করলেন না। নিজে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অনুসন্ধান ক'রে তিনি যখন জানলেন, সত্যই ঐ অমাত্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে, তখন একদিন তাকে তিনি কাছে ডাকলেন। বললেন ঃ—

ঃ দেখো, তুমি সত্যই অতিশয় অন্যায় কাজ করেছো। সেই অপরাধে তোমাকে আর এ-রাজ্যে থাকতে দেওয়া আমার উচিত নয়। তুমি এখনি স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি নিয়ে আমার রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাও।

রাজার আদেশে সেই অমাত্য বারাণসী ত্যাগ ক'রে চ'লে এলো। কোশলরাজ্যে প্রবেশ করলো সে।

একদিন সেই অমাত্য সুবিধা বুঝে কোশলরাজকে বলে ঃ—

ঃ মহারাজ, কাশীরাজ্য 'মক্ষিকাবিহীন মধুচক্রসদৃশ'। কাশীরাজের (বোধিসত্ত্বের) স্বভাব অত্যন্ত কোমল। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে কাশীরাজ্য অনায়াসে দখল করা যায়।

অন্য কোনো দেশের রাজার কথা হ'লে হয়তো কোশলরাজ অমাত্যের কথা তখনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কাশীরাজের

ক্ষেত্রে তিনি সেকথা মেনে নিতে পারলেন না। বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন ঃ—

ঃ সে কী হে? কাশী একটি বিস্তীর্ণরাজ্য! অথচ তুমি বলছো, অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে ঐরাজ্য দখল করা যায়। তোমার কথা শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি কাশীরাজের গুপ্তচর।

অমাত্য তখন দৃঢ়কণ্ঠে বলে ঃ—

ঃ না মহারাজ, আমি গুপ্তচর নই। আমি সত্য কথা বলছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, কাশীরাজ্যের সংলগ্ন কোনো গ্রামের লোকেদের হত্যা করবার জন্য লোক পাঠান। দেখবেন, ঐসব লোক ধরা প'ড়ে যখন কাশীরাজের কাছে দাঁড়াবে, তখন আপনার লোকেদের শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, ধন-দৌলত দিয়ে কাশীরাজ তাদের বিদায় করবেন।

শুনে কোশলরাজ বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করতে লাগলেন। অমাত্যের কথা অনুযায়ী কাজ করবেন, কি করবেন না—এই চিন্তাই করতে লাগলেন।

যা'হ'ক, শেষে কোশলরাজ স্থির করলেন—অমাত্যের কথামত কাজ ক'রে দেখাই যাক্ না।

কাশীরাজের প্রাসাদ। সিংহাসনে বসে আছেন দেব-জ্যোতিতে ভূষিত কাশীরাজ (বোধিসত্ত্ব)।

কাশীরাজের প্রহরীরা কয়েকজন লোককে ধ'রে এনেছে কাশীরাজের কাছে। প্রহরীদের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে ক্ষণকাল মৌন হয়ে থাকেন কাশীরাজ। তারপর তাদের শান্তকণ্ঠে বলেন :—

: বাবা, তোমরা গ্রামবাসীদের হত্যা করলে কেন ?

তারা বিনয়সহকারে বললে :—

: মহারাজ, আমাদের জীবিকা-নির্বাহের এছাড়া আর কোনোই উপায় নেই। পেটের দায়ে আমরা এই কাজ করেছি।

: যদি তাই হয়, তবে আমার কাছে আগে এলে না কেন ? মিছামিছি কতকগুলি নিরীহ ব্যক্তির জীবন তাহ'লে এভাবে নষ্ট হ'ত না! যাক্ বাপু, আর এমন কাজ তোমরা ক'রো না। এই নাও অর্থ। অর্থ নিয়ে তোমরা যে-যার ঘরে ফিরে যাও। দেখো, প্রাণিহত্যা বড় গর্হিত কাজ। এতে দেবতা কখনো প্রসন্ন হন না।

এই ব'লে কাশীরাজ ওদের প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন।

ওরা সবাই ফিরে আসে কোশলরাজের কাছে। সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। কিছুই গোপন করে না।

কিন্তু তবু কোশলরাজ কাশীরাজের রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করলেন না। তিনি কাশীরাজ্যের অন্তর্বর্তী কোনো একটি গ্রামে অত্যাচার-নির্যাতন করবার জন্য পুনরায় লোক

পাঠালেন। সেবারও তারা কাশীরাজের কাছ থেকে অনুরূপ ভালো ব্যবহার পেয়ে কোশলরাজের কাছে ফিরে এলো। ফিরে এসে তারা পূর্বের মতো সবকথা কোশলরাজকে খুলে বললে। এতেও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে পারলেন না কোশলরাজ। তিনি পুনরায় একদল লোককে বারাণসীর রাজপথে লুঠ-পাট করতে পাঠালেন। এবারও কাশীরাজ ওদের অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন। পর পর এই তিনটি ঘটনায় কোশলরাজের বিশ্বাস হ'ল যে, কাশীরাজ সত্যই নিরতিশয় ধর্মপরায়ণ এবং নিরীহ ব্যক্তি।

কোশলরাজ আর কালবিলম্ব না ক'রে সৈন্য সামন্ত নিয়ে বারাণসী-রাজ্য অধিকার করবার জন্য যাত্রা করলেন।

কাশীরাজের সেই সময়ে এক হাজার মহা যোদ্ধা ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অসাধারণ ক্ষমতাশালী। যুদ্ধে তাঁরা কখনো পশ্চাৎ-অপসরণ করতেন না। হাজার বিপদেও তাঁরা থাকতেন অচল, অটল। কাশীরাজের অনুমতি পেলে সেই এক হাজার মহা যোদ্ধা জম্বুদ্বীপের সমস্ত রাজ্য অনায়াসে জয় করতে পারতেন। এমনি ছিল তাঁদের শৌর্য-বীর্য।

কোশলরাজ বারাণসী জয় করতে আসছেন। এই সংবাদ সেই এক হাজার মহা বীর্যবান সৈন্যেরা জানতে পারেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে ছুটে এসে বলেন ঃ—

ঃ মহারাজ, অনুমতি দিন। আমাদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গেই কোশলরাজকে বন্দী ক'রে আপনার কাছে নিয়ে আসি।

শুনে কাশীরাজ শান্তকণ্ঠে বললেন :—

: বাবা, উত্তেজিত হ'য়ো না। উত্তেজিত হওয়া অশুভ লক্ষণ। আমি চাই—আমার জন্য যেন অন্য কারুর অনিষ্ট না হয়। যাদের আমার রাজ্যের প্রতি লোভ আছে, তারা ইচ্ছা করে তো আমার রাজ্য অধিকার করুক। তোমরা বাধা দিও না।

ওদিকে কোশলরাজ কাশীরাজ্যের সীমা লঙ্ঘন ক'রে লোকালয়ে প্রবেশ করলেন। কাশীরাজের অমাত্যেরা তখন তাঁর কাছে গিয়ে যুদ্ধ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কাশীরাজ তাঁদেরও শান্ত করলেন।

কোনো বাধা না পেয়ে কোশলরাজ কাশীরাজের রাজধানীর পুরোভাগে এসে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। দূত কাশীরাজের কাছে আসেন। বলেন উদ্ধত ভাবে :—যদি বাসনা থাকে, যুদ্ধ করো। নয় তো, এ-রাজ্য ছেড়ে দাও।

শান্তকণ্ঠে কাশীরাজ বলেন :—

: যুদ্ধ আমি করবো না। কিছুতেই নয়। আমার জন্য শত-সহস্র প্রাণীর জীবন নাশ হবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি রাজ্য ছেড়ে দেবো। ইচ্ছা হয়, আপনি গ্রহণ করুন।

রাজার কথা শুনে তাঁর অমাত্যেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন :—মহারাজ, আদেশ করুন। কোশলরাজকে নগরে প্রবেশ করতে দেবো না। বাইরে যুদ্ধ ক'রেই তাঁকে জীবিত-অবস্থায় বন্দী ক'রে আপনার কাছে আনি। মহারাজ, একবার

আদেশ করুন। কোশলরাজের পররাজ্য আক্রমণ-স্পৃহা আমরা চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দি'।

কাশীরাজ (বোধিসত্ত্ব) দীপ্তকণ্ঠে ব'লে উঠলেন :—না, না। সে হয় না। কোশলরাজ আমার রাজ্য অধিকার করতে চান। করুন তিনি আমার রাজ্য অধিকার। গ্রহণ করুন তিনি এই সিংহাসন, ধন-দৌলত—ঐশ্বর্য।

এই ব'লে তিনি তৎক্ষণাৎ নগরদ্বার স্বহস্তে খুলে দিলেন। খুলে দিয়ে অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে গিয়ে উপবেশন করলেন।

সুযোগ পেয়ে কোশলরাজ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পুরমধ্যে প্রবেশ করলেন। কেউ তিলমাত্র বাধা দিলে না। কেউ গতিরোধ করলে না।

রাজভবনে উপস্থিত হলেন কোশলরাজ। সভামণ্ডপে প্রবেশ করলেন। কাশীরাজ এবং তাঁর অমাত্যদের বন্দী ক'রে সৈন্যদের আদেশ দিলেন :—এদের পিছমোড়া ক'রে বাঁধো। 'আমক শ্মশানে' (যেখানে শব দাহ করা হয় না। শব পচে গেলে শিয়াল, কুকুরকে দিয়ে খাওয়ান হয়।) গর্ত খুঁড়ে ওদের গলা পর্যন্ত মাটির মধ্যে পোঁত। গর্তের মাটি চারিদিকে এমন ক'রে পিটে দাও যেন ওরা কেউ হাত-পা' নাড়তে না পারে। তাহ'লে রাত্রিবেলা ওদের শিয়াল, কুকুরে খেয়ে ফেলবে।

কোশলরাজের সৈন্যেরা তাঁদের সবাইকে 'আমক শ্মশানে' নিয়ে আসে। সেখানে গর্ত খুঁড়ে মধ্যভাগে রাজাকে এবং

দু'পাশে অমাত্যদের আগ্রীব মাটির ভিতর পুঁতলে। তারপর গর্তের মধ্যে মাটি ফেলে এমন ভাবে মাটি পিটলে যে, কারুর আর নড়বার-চড়বার ক্ষমতা রইলো না। এই অবস্থায়ও রাজা মহাশীলবানের (বোধিসত্ত্বের) মনে কোনোপ্রকার অসন্তোষের ভাব দেখা গেলো না। কোশলরাজের লোকজন চ'লে গেলে মহাশীলবান্ শান্তকণ্ঠে স্মিতমুখে অমাত্যদের বললেন ঃ—

ঃ ভাই, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ করো। অন্য কোনো ভাবকে মনে স্থান দিও না! বিপদে এবং বিপর্যয়েও মানুষের মনে সম্প্রীতির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্তব্য।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এলো। সন্ধ্যার পর রাত্রি। রাত্রির পর গভীর রাত্রি। গভীর রাত্রে একদল শিয়াল নরমাংস আহার করবার জন্য সেইস্থানে এলো। ওদের দেখে রাজা ও অমাত্যেরা একসঙ্গে এমন এক বিকট চীৎকার ক'রে উঠলেন যে, শিয়ালেরা তা' শুনে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। কিছু দূরে গিয়ে ওরা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে চায়। দেখলে— কেউ ওদের অনুধাবন করছে না। এতে ওদের ভয় ভেঙ্গে যায়। ওরা আবার ফিরে আসে। এবারও পূর্বের মতো রাজা ও অমাত্যেরা বিকট চীৎকার ক'রে উঠলেন। এবারও শিয়ালেরা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে যায়। এইভাবে একে একে তিনবার পালিয়ে গিয়ে ওরা যখন দেখলে, কেউ-ই ওদের তাড়া করছে না, তখন ওদের সাহস খুবই বেড়ে গেলো। ওরা কেমন ক'রে জানি বুঝতে পারে—এঁরা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায়

নিবদ্ধ। সুতরাং, এবার ওরা আর পলায়ন করলে না। ওদের দলপতি উদ্যত হ'ল রাজাকে দংশন করতে এবং দলপতির দেখাদেখি অন্যান্য শিয়ালেরা উদ্যত হ'ল অমাত্যদের দংশন করতে।

উপায়-কুশল কাশীরাজ শিয়াল-দলপতিকে তাঁর দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে নিজের গ্রীবাটি বাড়িয়ে দেন। শিয়াল-দলপতি ভাবে—কাশীরাজ বুঝি তার দংশনের সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন। এই ভেবে সে যেমন কাশীরাজকে দংশন করতে উদ্যত হ'ল, সেই মুহূর্তে কাশীরাজ-ই শিয়াল-দলপতির গ্রীবা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। কাশীরাজের হনুতে (গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল) এবং দেহে হস্তীর মতো বল ছিল। কাজেই, শিয়াল-দলপতি তাঁর কবল থেকে মুক্তি পেলে না। তখন সে জীবনের ভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সেই আর্তনাদে অন্যান্য শিয়ালেরা ভাবলে—নিশ্চয়ই তাদের দলপতি মানুষের হাতে ধরা পড়েছে। এই ভেবে তারা শঙ্কিত হয়ে অমাত্যদের পরিতাগ ক'রে যে যেদিকে পারলে ছুটে পালিয়ে গেলো।

ওদিকে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো।

কাশীরাজ যে-শিয়ালটিকে হনুদ্বারা ধ'রে রেখেছিলেন, সে ভীষণভাবে লাফালাফি, দাপাদাপি করাতে কাশীরাজের চারিপাশের মাটি শিথিল হয়ে উঠলো। চারিপাশের মাটি শিথিল হয়ে গেছে জেনে, কাশীরাজ শিয়ালটিকে ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দিয়ে তিনি দেহের অসীম শক্তিতে নিজের সবল বাহু-

ছ'টি মুক্ত ক'রে উপর দিকে তুললেন। তারপর গর্তের ছ'ধার ধ'রে গর্ত থেকে ধীরে ধীরে বেরিরে এলেন। বেরিয়ে এসে তাঁর অমাত্যদের উদ্ধার করলেন।

ঐ শ্মশানে থাকতো অনেকগুলি যক্ষ। ওদের প্রত্যেকের জন্য এক-একটি অংশ নির্দিষ্ট ছিল। সেদিন ছ'টি যক্ষের অংশের সীমার উপর কয়েকজন একটি মানুষের শব ফেলে রেখে গিয়েছিল। যক্ষ ছ'টি ঐ শবের দখল নিয়ে নিজেদের মধ্যে বড়ো বিবাদ করতে লাগলো! বিবাদের কোনো মীমাংসা করতে না পেরে তারা বললে :—

: আর বিবাদে কাজ নেই। মহাশীলবান্‌রাজ ওখানে আছেন। চলো, তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের এই বিবাদের মীমাংসা ক'রি। উনি সাতিশয় ধার্মিক ব্যক্তি। এই শবটি ভাগ ক'রে আমাদের যাঁর যেটুকু প্রাপ্য উনি ঠিক ক'রে দেবেন।

এই ব'লে তারা শবটির পা' ধরে টান্‌তে টান্‌তে রাজার কাছে নিয়ে এলো এবং তাদের ঐ শবটিকে ভাগ ক'রে দিতে রাজাকে অনুরোধ জানালে।

যক্ষ ছ'টির অনুরোধ শুনে মহাশীলবান্‌রাজ বলেন :—

: বেশ কথা। শব আমি ভাগ ক'রে দেবো। কিন্তু এখন আমি অশুচি অবস্থায় আছি। আগে আমাকে স্নান করাও।

কোশলরাজের জন্য যে-সুবাসিত জল ছিল, যক্ষ ছ'টি তাদের নিজেদের প্রভাবে তা' নিয়ে এসে মহাশীলবান্‌রাজকে স্নান

করালে। স্নান করানো শেষ হয়ে গেলে কোশলরাজের জন্য যে-পরিচ্ছদ ছিল, তা' এনে মহাশীলবান্‌রাজকে পরালে। নানারকম সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পে তাঁকে সাজালে। বললে ঃ—

ঃ মহারাজ, আর কিছু অনুমতি করবেন কি ?

মহাশীলবান্‌রাজ বলেন ঃ—

ঃ আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। কিছু আহার করতে চাই।

ঃ এই কথা ? মহারাজ, আপনি ভাবেন না। আমরা এখনি আপনার জন্য নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য নিয়ে আসছি। বলে দু'টি যক্ষ। ব'লেই ওরা চলে যায়। নিয়ে আসে তখনি নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য যা', কোশলরাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

কাশীরাজ সেই সুস্বাদু খাদ্য পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন।

যক্ষেরা তখন আবার জিজ্ঞাসা করে ঃ—

ঃ প্রভু, আর কি করতে হবে, আদেশ করুন!

তখন কাশীরাজ বলেন ঃ—

ঃ কোশলরাজের বালিশের নীচে আমার 'মঙ্গল-খড়্গ' আছে। সেই খড়্গটি তোমরা নিয়ে এসো।

ঃ আপনার আদেশ শিরোধার্য, মহারাজ! ব'লেই যক্ষেরা মায়াবলে চক্ষের পলকের মধ্যেই সেই 'মঙ্গল-খড়্গ' নিয়ে আসে। তুলে দেয় মহারাজের হাতে।

কাশীরাজ 'মঙ্গল-খড়্গ' এক হাতে নিলেন। সেই শবটিকে আর এক হাতে দাঁড় করালেন। তারপর শবটির মাথার উপর প্রচণ্ড আঘাত ক'রে সমান দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক অংশ দিলেন একটি যক্ষকে, আর একটি অংশ দিলেন আর একটি যক্ষকে।

কাশীরাজ 'মঙ্গল-খড়্গ' পরিষ্কার ক'রে কোষের মধ্যে রাখেন।

নরমাংস আহার ক'রে যক্ষ দু'টি খুশী হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে :—

: প্রভু, আদেশ করুন, আর কি করতে হবে ?

কাশীরাজ এবার বলেন :—

: তোমরা আমাকে কোশলরাজের শয়নকক্ষে আর আমার অমাত্যদের নিজেদের গৃহে রেখে এসো।

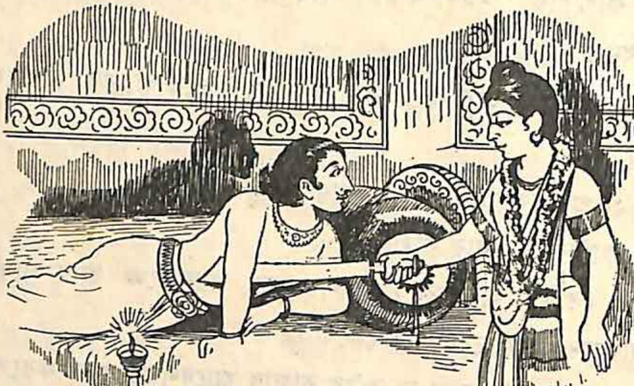
যক্ষেরা কালক্ষেপ না ক'রে রাজার আদেশমত কাজ করলে।

শয়নকক্ষ। কোশলরাজ কাশীরাজের বিছানায় নিদ্রা যাচ্ছেন। গভীর নিদ্রা !

এমন সময় কাশীরাজ কোশলরাজের শিয়রে দাঁড়িয়ে খড়্গ দিয়ে উদরে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে কোশলরাজের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হ'ল। কক্ষমধ্যের যে-দীপালোক কক্ষটিকে আলোকিত করছিল, তার সাহায্যে তিনি কাশীরাজকে চিনতে পারলেন। কি কারণে জানিনে,

কোশলরাজের বিশাল বক্ষ প্রাণের ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ভয়ের ভাবটি সংযত ক'রে সাহসে ভর দিয়ে বিছানার উপর উঠে বসলেন। বললেন থেমে থেমে :—

: কাশীরাজ? কিন্তু এখানে কেন? এখন গভীর রাত্রি। চারিদিকে প্রহরীরা সতর্ক। দ্বারগুলি সব অর্গলবদ্ধ। আমার



এই শয়নকক্ষে জনপ্রাণীর প্রবেশ করবার সাধ্য নেই। আপনি কী ক'রে এখানে প্রবেশ করলেন?

কাশীরাজ তখন স্বভাব-কোমল-স্বরে সমস্ত ঘটনাটি বললেন।

শুনে কোশলরাজের মন অপরিসীম অনুশোচনায় পরিপ্লুত হয়ে উঠলো। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে থেমে থেমে বলতে লাগলেন :—

: রক্তমাংসাশী, ভীষণ ও নিষ্ঠুর যক্ষেরা পর্যন্ত আপনার সহৃদয়তা, ক্ষমা, মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারলে, আর আমি

মানুষ হয়েও আপনাকে চিনতে পারিনি! ধিক্ আমাকে! শত ধিক্! ব'লতে ব'লতে অত্যন্ত মর্মবেদনায় কোশলরাজ অশ্রুপাত করতে লাগলেন। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন :—

: মহারাজ, আমার মতো নরাধম আর জগতে নেই। আমি দুষ্ট অমাত্যের কথায় আপনার রাজ্য আক্রমণ করেছিলেম। মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন! আপনার ঐ খড়্গ স্পর্শ ক'রে, আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে শপথ করছি—আমি আর কখনো আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবো না।

পরদিন প্রভাতবেলা।

কোশলরাজ ভেরী বাজিয়ে রাজ্যের সমস্ত সৈন্য, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদের সমবেত করলেন। তাঁহাদের সবাইয়ের সামনে মহাশীলবান্‌রাজের গুণকীর্তন ক'রে সভামধ্যে আবার মহাশীলবান্‌রাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তারপর তাঁকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বললেন :—

: মহারাজ, আজ থেকে এই রাজ্যের বিদ্রোহীদের দমন করবার সমস্ত ভার আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেম। আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করবো। আপনি নিশ্চিন্তমনে প্রজা পালন করুন।

এই ব'লে কোশলরাজ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কাশীরাজ্য ছেড়ে নিজের রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলেন।

কাশীরাজ (বোধিসত্ত্ব) নিজের স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করলেন। তাঁর মাথার উপরে পূর্বের মতোই 'স্বেতছত্র' শোভা

পেতে থাকে। তিনি তখন নিজের কথা স্মরণ ক'রে ভাবতে থাকেন ঃ—আমি যদি দশজনের মতো হতাশ হয়ে পড়তেম, তাহ'লে এই সিংহাসন ফিরে পেতেম না। আমার অমাত্যদের জীবনও আমি পারতেম না রক্ষা করতে। উদ্যম ও উৎসাহ বলেই আমি পুনর্বার রাজ্য পেলেম। অমাত্যদেরও জীবন রক্ষা হ'ল। উৎসাহ-উদ্যমের কী মহিমা! 'শীলসম্পন্ন' শৌর্য-বীর্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা কখনো নিষ্ফল হয় না।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন একটি উৎসাহ-হীন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ—বাবা, তুমি নাকি হতাশ হয়ে পড়েছো?

ভিক্ষু উত্তর দিলেন ঃ—হ্যাঁ, ভগবন্।

বুদ্ধ বললেন ঃ—সে কি কথা? আমার আশ্রমে থেকেও তুমি হতাশ হয়ে পড়েছো? দেখো বাবা, হতাশ হ'য়ো না। উৎসাহ-বলে সব কিছুই করা যায়। অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রাচীনকালে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা রাজ্যচ্যুত য়েও উৎসাহ-বলে হৃত সৌভাগ্য পুনর্বার লাভ করেছিলেন।

এই ব'লে বুদ্ধ তাঁর একটি অতীত-জীবনের ঐ ঘটনাটি ভিক্ষুকে বললেন। সেই সময়ে বুদ্ধ ছিলেন—মহাশীলবান্‌রাজ বা কাশীরাজ। দেবদত্ত ছিলেন—সেই বিভীষণ অমাত্য। বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিলেন—বিনয়ী, শিষ্টাচারী এবং বিশ্বাসী অমাত্য।

অনুশীলনী

ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক ঃ—

(১) 'ভগবানবুদ্ধ তাঁর জন্মান্তর কথায় তখনকার সমাজের নিখুঁত-চিত্র আমাদের চোখের উপর তুলে ধরেছেন।' লেখকের বর্ণনা হইতে এ বিষয়ে যাহা পড়িয়াছে, বিশদভাবে তাহার বিবরণী দাও।

(২) 'বৌদ্ধসাহিত্যে দেখা যায়, ভগবান গৌতমবুদ্ধ বহুবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই পৃথিবীতে।'

লেখকের বিবৃতি হইতে নিম্নের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর লিখ ঃ—

(ক) কতবছর পূর্বে গৌতমবুদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) দেবত্বলাভের সম্বন্ধে বৌদ্ধদের মত কি?

(গ) বৌদ্ধেরা কি জন্মান্তর বিশ্বাস করেন?

(ঘ) বৌদ্ধদের মতানুযায়ী কর্ম ও নির্বাণ সম্বন্ধে কি জান?

(৩) ব্রহ্মদত্ত কোমলস্বরে বলেন—সখে মৃগরাজ, আমি তো তোমায় অভয় দিয়েছি। তবে কেন ধর্মগণ্ডিকার উপর মাথা রেখেছো?

এই বিবৃতির সূত্র ধরিয়া নিম্নের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও ঃ—

(ক) সখে মৃগরাজ কাহাকে বলা হইতেছে?

(খ) ব্রহ্মদত্ত তাঁহাকে কি অভয় দিয়াছিলেন?

(গ) 'ধর্মগণ্ডিকা' বলিতে কি বুঝিয়াছ? ধর্মগণ্ডিকার উপর কি জন্য মৃগরাজ মাথা রাখিয়াছিলেন?

(৪) (ক) ন্যগ্রোধমৃগ-জাতক হইতে কি শিক্ষালাভ করিলে?

(খ) ন্যগ্রোধমৃগরাজ রাজা ব্রহ্মদত্তকে যে-পঞ্চশীল সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা কর।

অসম্পদান-জাতক—

(১) 'দেখো বাবা, দেবদত্ত পূর্বজন্মেও অকৃতজ্ঞ ছিল।'

(ক) কে ঐ কথা বলিতেছেন ?

(খ) কোথায় বলিতেছেন ?

(গ) কাহাদের বলিতেছেন ?

(ঘ) কি প্রসঙ্গে বলিতেছেন ?

(২) 'মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ নদীর জোয়ার-ভাঁটার মত।'

লেখকের এই উক্তির সূত্র ধরিয়া নিম্নের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও :—

(ক) কাহার উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হইয়াছে ? কোন্ পুস্তকে বলিতেছেন ? কোথায় এবং কে বলিতেছেন ?

(খ) কেন বলা হইয়াছে ?

(৩) 'যে বন্ধুকে তুমি নিজের ঐশ্বর্যের অর্দ্ধেক অকাতরে দান ক'রে দিয়েছো, সেই বন্ধুর এই কি কৃতজ্ঞতা ?'

কে এই কথা বলিতেছেন ? কাহাকে বলিতেছেন ? কে কাহাকে তাঁহার অর্দ্ধেক ঐশ্বর্য অকাতরে দান করিয়াছিলেন ? কেন করিয়াছিলেন ? দাতার মনের কি পরিচয় এখানে পাওয়া যায় ?

(৪) 'এই কি চল্লিশকোটি মুদ্রার প্রতিদান ?' এই সূত্র ধরিয়া অসম্পদান-জাতকে ইহার স্বপক্ষে শঙ্খশ্রেষ্ঠী (বোধিসত্ত্ব) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ ভাব এবং ভাষাটি উদ্ধৃত কর।

কুদ্দাল-জাতক

(১) কুদ্দাল-জাতকের আখ্যায়িকা হইতে তোমরা কি শিখিলে?

(২) কুদ্দাল-জাতকের আখ্যায়িকাটি হইতে নিম্নের বিষয়গুলির সম্বন্ধে লিখ :—

(ক) ধর্মসভায় যখন চিত্রহস্ত সারীপুত্রের অর্হত্বলাভকে উপলক্ষ্য করিয়া ভিক্ষুরা আলোচনা করিতেছিলেন, তখন ভগবানবুদ্ধ সেখানে উপস্থিত হইয়া **তাঁহাদের যে-কথা বলিয়াছিলেন,** তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী,

(খ) রাজা ব্রহ্মদত্ত যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজধানীর দিকে ফিরিতেছিলেন, তখন **তিনি বোধিসত্ত্বকে যে-কথা বলিয়াছিলেন,**

(গ) ব্রহ্মদত্তের কথার পর, **বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তকে যে-কথা বলিয়াছিলেন।**

(৩) কুদ্দাল-জাতকের আখ্যায়িকাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

খদিরাঙ্গার-জাতক :—

(১) 'মারের চোখের উপর এই ঘটনা ঘটলো।'

(ক) যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার পূর্ণ বিবরণী খদিরাঙ্গার-জাতকটি অবলম্বন করিয়া লিখ।

(খ) এই আখ্যায়িকা হইতে কি উপদেশ পাইলে?

(গ) এই আখ্যায়িকাটি ভগবানবুদ্ধ কাহাকে বলিয়াছিলেন?

(ঘ) ইহা কি ভগবানবুদ্ধের অতীত জন্মের কথা?

(ঙ) যদি অতীত-জন্মের কথা হয়, তবে সে-জন্মে ভগবানবুদ্ধ কে ছিলেন?

(২) খদিরাঙ্গার-জাতক হইতে নিম্নের বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথাযথ উত্তর দাও :—

(ক) পিতার মৃত্যুর পর বোধিসত্ত্ব কি পদ লাভ করিলেন ?

(খ) পদলাভ করিয়াই বোধিসত্ত্ব কি সৎকার্য করিলেন ?

(গ) বারাণসী-নগরের প্রত্যেক বুদ্ধেরা তখন কি করিতেন ?

(ঘ) 'প্রত্যেকবুদ্ধকে' যখন বাধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন, তখন বোধিসত্ত্ব কি করিলেন ?

(ঙ) বোধিসত্ত্বের সৎ-কাজে বাধা দিতে দুরাত্মা 'মার' কি পন্থা অবলম্বন করিল ?

(চ) 'মারের' সর্বপ্রকার বাধাদান কি করিয়া বোধিসত্ত্ব ব্যর্থ করিলেন।

(ছ) এই প্রসঙ্গে বোধিসত্ত্ব ও 'মারের' মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাও।

কপোত-জাতক :—

(১) কপোত-জাতক হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাযথ উত্তর দাও।

(ক) বুদ্ধের সেই অতীত-কথায় বুদ্ধ কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(খ) দুষ্ট কাকটি এ জন্মে কে ?

(গ) বারাণসীর অধিবাসীরা তখন পুণ্যকামনায় কি করিতেন ? বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচক সেই পুণ্যকামনায় কি করিয়াছিল ? বোধিসত্ত্ব কোথায় থাকিতেন ?

(ঘ) রান্নাঘরের মাছের গন্ধ পাইয়া কাকটি কি করিয়াছিল ?

(ঙ) কাক কি মতলব করিল ?

(চ) লোভের বশবর্তী হইয়া কাকের শোচনীয় পরিণতি কি করিয়া হইল ?

(ছ) কাকের শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া পারাবতরূপী বোধিসত্ত্ব কি বলিয়াছিলেন ?

লোশক-জাতক ঃ—

(১) মিত্রবিন্দকের বাল্যজীবন বর্ণনা কর।

(২) মিত্রবিন্দকের জলভ্রমণ বর্ণনা কর।

(৩) 'প্রভু, আমি কি পাপ করেছিলেম, বলবেন কি ?' এই সূত্র ধরিয়া নিম্নের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাও।

(ক) কে এই কথা বলিতেছে ? কাহাকে বলিতেছে ?

(খ) যাহাকে বলা হইতেছে, তিনি তাহার পাপের সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবর দাও।

লক্ষণ-জাতক ঃ—

(১) 'দেবদত্ত যে বুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, এইটাই প্রমাণ করবার জন্য তিনি পাঁচটি নিয়ম বুদ্ধের কাছে প্রস্তাব করেন।'

পাঁচটি নিয়ম কি কি ?

(২) ভগবান বুদ্ধ কি ঐ সকল নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ? দেবদত্ত তখন কি করিলেন ?

(৩) লক্ষণ-জাতক আখ্যায়িকাটি পড়িয়া কি শিক্ষালাভ করিলে ?

মৃতকভক্ত-জাতক ঃ—

(১) 'এই ব'লে ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের প্রাণিহত্যা করতে নিষেধ ক'রে তাঁর অতীত-জন্মের ঐ ঘটনাটি বললেন।' ঐ সূত্র ধরিয়া উত্তর কর ঃ—

(ক) ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের কি বলিলেন ?

(খ) ভগবান গৌতমবুদ্ধ তাঁহার অতীত-জন্মের যে ঘটনাটি বলিলেন, তাহার বিবরণী দাও।

পঞ্চায়ুধ-জাতক ঃ—

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে যাহা জান, লিখ ঃ—

(ক) শ্লেষলোম যক্ষ

(খ) পঞ্চবিধ আয়ুধ ও পঞ্চায়ুধকুমার

(গ) অহিংসক ও অঙ্গুলিমাল।

(ঘ) প্রসেনজিৎ

সুবর্ণহংস-জাতক ঃ—

(১) অতিলোভে যে মানুষের সমূহ ক্ষতি হয়, তাহা প্রমাণ করিতে ভগবানবুদ্ধের সুবর্ণহংস-জীবনটি বর্ণনা কর।

(২) ব্রাহ্মণীর চরিত্রটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁহার কন্যারা যে পিতার প্রতি সমবেদনাশীলা, তাহার কি প্রমাণ দেখাইতে পারো?

একপর্ণ-জাতক ঃ—

(১) 'রাজা ব্রহ্মদত্তের একটি অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির পুত্র ছিল।' এই বাক্যের পর হইতে—'সে ভালো ছেলে হয়ে সুনাম অর্জন করলে।'—এই বাক্য পর্য্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটিয়াছিল (সংলাপসহ) তাহার পূর্ণ বিবরণী দাও।

কূটবাণিজ-জাতক ঃ—

(১) নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ—

(ক) বোধিসত্ত্ব কোন্ সময়ে বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? তখন বারাণসীর রাজার নাম কি ছিল? তখন বোধিসত্ত্বের নাম কি ছিল?

(খ) 'বোধিসত্ত্ব যখন পূর্ণবয়স্ক হলেন, তখন আর একজন বণিকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়।' সেই বণিকের নাম কি? তিনি কেমন লোক ছিলেন?

(গ) দুই জনায় কি ব্যবসা সরু করিলেন?

(ঘ) তাঁহাদের লাভের অংশ ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিবাদের সৃষ্টি হইল, তাহা যথাযথ সংলাপসহ বর্ণনা কর।

কটাহক-জাতক ঃ—

নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ—

(ক) বোধিসত্ত্ব কটাহককে ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করিলে, একদিন কটাহক তাহার চাকুরী সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছিল?

(খ) চিন্তা করিবার পর কটাহক কি অসৎ ক্রিয়াটি সাধন করিয়াছিল? প্রভুর বন্ধুকে সে কি লিখিয়াছিল? সে কি ভালো কাজ করিয়াছিল বলিয়া তোমার মনে হয়?

(গ) যে শ্লোকটি বোধিসত্ত্ব কটাহকের স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার মূল অর্থ কি? সেই শ্লোকটি পড়িয়া কটাহকের কি কিছু ভালো হইয়াছিল?

মহাশীলবজ্-জাতক ঃ—

(১) নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ—

(ক) কাশীরাজের প্রহরীরা যখন কোশলরাজের কয়েকজনকে ধরিয়া কাশীরাজের কাছে আনিল, তখন কাশীরাজ ঐসব লোককে সম্বোধন করিয়া কি কথা বলিয়াছিলেন? তাহারা কি বলিয়াছিল? তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কাশীরাজ করিয়াছিলেন?

(খ) কোশলরাজ যখন কাশীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন কাশীরাজের সৈন্যেরা তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন? কাশীরাজ তাঁহাদের কি বলিয়াছিলেন? কাশীরাজের এক হাজার মহা যোদ্ধার সম্বন্ধে কি জান?

(গ) আমক শ্মশানে কাশীরাজ এবং তাঁহার অমাত্যদের কঠোর শাস্তি কিরূপ হইয়াছিল? এবং সেই কঠোর শাস্তি পাইয়াও কাশীরাজ তাঁহাদের কি উপদেশ দিয়াছিলেন? কাশীরাজের চিত্তের কোন্ ভাবটি এখানে উন্মেষ হইয়াছে?

(ঘ) কাশীরাজ্যের রাজ্য আক্রমণ করিতে যখন কাশীরাজের বিভীষণ অমাত্য কোশলরাজকে প্ররোচিত করে, তখন কোশলরাজ অবিশ্বাস্যে কি কথা বলিয়াছিলেন? সেই কথার জবাবে অমাত্য কি কথা কোশলরাজকে বলিয়াছিল?

(২) 'শয়ন কক্ষ! কোশলরাজ কাশীরাজের বিছানায় নিদ্রা যাচ্ছেন।' লেখকের এই বর্ণনার পর হইতে, কোশল-রাজের কাশীরাজ্য ছাড়িয়া নিজ রাজ্যে যাত্রা করিবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছিল, সংলাপসহ তাহার পূর্ণ বিবরণী দাও।

(৩) 'মহাশীলবজ্-জাতক', এই আখ্যায়িকাটি শিষ্যদের কাছে বলিবার কি উদ্দেশ্য ছিল ভগবানবুদ্ধের? এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের কথাগুলি উদ্ধৃত কর।

(৪) 'ভাই, হৃদয়ে মৈত্রী পোষণ করো। অন্য কোনো ভাবকে মনে স্থান দিও না। বিপদে এবং বিপর্যয়ে মানুষের মনে সম্প্রীতির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্তব্য।'

(ক) কে এই কথা বলিতেছেন? (খ) কাহাদের বলিতেছেন? (গ) কি প্রসঙ্গে বলিতেছেন? (ঘ) মহাশীলবান্‌রাজ নিজেকে এবং তাঁহার অমাত্যদের কি করিয়া বন্ধনমুক্ত করিলেন?

(৫) 'বৌদ্ধসাহিত্যের আখ্যায়িকা—দ্বিতীয় খণ্ড' হইতে ভারতের প্রাণধর্ম এবং সুবৃহৎ ঐতিহ্যের সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।